ঝরণা কলম

ঝরণা কলম

শ্রীগোপীনাথ নন্দী

ডি এম্ লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

'দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা

যিনি বাঙলা সাহিত্যকে সম্পদ্‌শালী ক'রেছেন, বর্তমান

বাঙলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

মহোদয়ের করকমলে

সূচী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অহিভূষণ দত্ত বি-এল্ মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই গ্রন্থের আগাগোড়া প্রুফ্ দেখে দিয়েছেন। সেইজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৯

ঝরণা কলম

সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী আস্তে আস্তে ফাঁকা হ'য়ে গেল। এখন কেবল গুটি চার পাঁচ ছাত্র এখানে ওখানে ব'সে পড়ছে নিঃশব্দ নিবিষ্টতায়। এক কোণে শেষের ঐ আসনটিতে ব'সে যে ছাত্রটি এক মনে পড়ে যাচ্ছে ঐ ত' আমাদের নলিন।

পড়তে পড়তে হঠাৎ নলিন তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠল'। কয়েকবার এ পকেট সে পকেট হাতড়ালে; কয়েকবার পঠিত বইখানি ও স্মারকলিপির খাতাখানি টেবিলের উপর আছড়ালে; যেখানে সে বসে ছিল তার নীচে এদিকে ওদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে; কিন্তু কোথাও তার মূল্যবান্ ঝরণা-কলমটিকে পাওয়া গেল না।

কলেজে আসবার সময় কলমটিকে যে সঙ্গে এনেছিল তার প্রমাণ ত' ঐ খাতার মধ্যেই রয়েছে। এই কলেজেই কোথাও খোয়া গেছে; আর একবার যখন খোয়া গেছে তখন আর ফিরে পাবার আশা নেই।

কলম খুঁজতে খুঁজতে সাতটা বাজল' ; লাইব্রেরী জনশূন্য হ'য়ে গেল। চারি দিকের জানলা দরজা সশব্দে বন্ধ হ'তে লাগল' আর ঘরে ও বাহিরে কয়েকটি ঝাড়ুদার ঝাঁটু দিয়ে দিয়ে চারি দিকে ধূলোর মেঘ সৃষ্টি ক'রতে লেগে গেল। সেই ধূলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে মেঘমলিন অন্তঃকরণে হারানো কলমটির কথা ভাবতে ভাবতে নলিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল' একান্ত ক্ষুণ্নমনে।

রাস্তার মিটমিটে আলোতে নলিনের চোখ দুটো চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল', বোধ হয় জলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করায় বাবার কাছ থেকে নলিন এই ঝরণা-কলমটি উপহার পায়। বাবা আর বেঁচে নেই ; কিন্তু বুক পকেটে গোঁজা এই কলমটি এতদিন নলিনের বুকে তার বাবার স্নেহের স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। কলমটি হারিয়ে তাই নলিনের নূতন করে মনে পড়ে গেল, আর বাবা বেঁচে নেই।

* * * * *

পরের দিন সকালে যখন নলিনের ঘুম ভাঙ্গল', তখনও যেন মনে হ'ল কলম হারানোর ব্যথা তার বুকে জমাট বেঁধে আছে। উৎকট একটা দুঃখ, কি উৎকট একটা সুখের সময় নলিনের হৃদয় তন্ত্রী যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। তাই অলসভাবে বিছানায় শুয়ে থেকে অতি করুণ স্বরে নলিন গুণগুণ ক'রে গান ধরলে, "আজ সাথে নেই, চিরসাথী সেই আমার ঝরণা কলম।" গানের কিন্তু সুর মিলল' না ; ছন্দও মেলাতে পারা গেল না। তাই নলিন দুত্তোর বলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল' ; মনে মনে বললে, "ভারীত একটা কলম তার জন্যে আবার ভাবনা।"

কিন্তু ভাবনার কি আর শেষ আছে। ঘুম চোখ রগড়াতে

রগড়াতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে যে সকালের ল ক্লাশের দফাও গয়া, আটটা বেজে গেছে। নলিন ভাবলে—"ধেৎ রোজ রোজ ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে কলেজে ছোটা একটা আপদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আর যাচ্ছি না। ভূপু আছে প্রকৃসি ম্যানেজ্ ক'রবে।"

তখন নিতান্ত অলসভাবে সে রাস্তার ধারে রকৃটির উপর ব'সে পড়ল', সেদিনকার খবরের কাগজখানি নিয়ে। এটা-ওটা-সেটা পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে নলিনের চোখ পড়ল'।

"পাওয়া গিয়াছে ! পাওয়া গিয়াছে !!

একটি ঝরণা-কলম !!!

যথার্থ প্রমাণ দিতে পারিলে প্রকৃত মালিককে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।"

বিজ্ঞাপনটি পড়ামাত্র নলিন ধাঁ ক'রে একটা জামা মাথা দিয়ে গলিয়ে ছুটল' ঐ ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

ঠিকানাটা খোঁজ করে যেতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না, কিন্তু সেই বাড়ীতে ঢুকতেই নলিন একেবারে থতমত খেয়ে গেল সামনেই তার কলেজের বন্ধু ভূপতিকে দেখে।

"কিরে ভূপু, তুই ?"

"এই ত আমাদের বাড়ী।"

"এই বিজ্ঞাপনটা তা হ'লে কে দিলে ?"

বিজ্ঞাপনটা দেখে ত ভূপতি হো হো করে হেসে উঠল'। অসময়ের এই হাসি দেখে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে নলিন বললে—"মানে ?"

ভূপতি বললে—"মানে, কলেজ্ টলেজ্ ছাড়ান দাও, দেশে গিয়ে চাষবাস দেখ, কাজ হবে।"

নলিন দ্বিরুক্তি না ক'রে রেগেমেগে হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছিল ; তার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে ভূপতি বললে—"আজকাল দিনে দুপুরেও কি হাসি-বৌ-ঠাকরুণের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রেছিস? কাল বেমালুম পকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে ধাক্কা মেরে জানিয়ে গেলুম ; কিছুই কি টের পেলিনি ?"

* * * *

মাস কয়েক আগে একটা ম্যাজিক্ দেখে এসে ভূপতি কলেজে বন্ধুদের পকেট থেকে পটাপট্ কলম তুলে নিয়ে হাতের কৌশল অভ্যাস ক'রতে লেগে গেল। প্রথম প্রথম বন্ধুরা হাতে-হাতে ধ'রে ফেলত আর মারত মাথায় চটাচট্ চাটি।

চাঁটি খেয়ে খেয়ে ভূপতির হাতের কৌশল যে ওস্তাদের মত পাকা হ'য়ে গেছে, ইদানীং বন্ধুরা সকলেই স্বীকার করে ; স্বীকার করতে চাহিত না কেবল নলিন। তাই তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে ভূপতিকে এতদূর পর্যন্ত আগাতে হ'য়েছিল।

* * * * *

বাড়ী ফিরতে ফিরতে নলিন ভাবতে লাগল, ভূপতি ত' তাকে খুব জব্দ করলে, কেমন করে তার শোধ তোলা যায়। নলিনের পাকা মাথা ; একটা ফন্দী বের করতে বেশীক্ষণ গেল না। মতলবটা মাথায় আসতেই তার মনটা লাফিয়ে উঠল', মনে মনে ব'ললে—"এইবার ভূপু, তোর ওস্তাদির অগ্নি-পরীক্ষা !"

পরের দিন সকালে কলেজে এসেই নলিন ভূপতির হাতটা ধরে সজোরে নাড়তে নাড়তে বললে—"কন্‌গ্রাচুলেশন্ ভূপতি, আমি এর আগে অনেক ম্যাজিক্ দেখেছি, কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ওস্তাদিতে তোর আসন সবার উর্ধ্বে।"

নলিনের রকম দেখে ক্লাসের আর সব বন্ধুরা নলিন ও ভূপতিকে এসে ঘিরে দাঁড়াল'।

আসর জমাটি দেখে রীতিমত বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে নলিন বললে—"একটা কাজ যদি তুই করতে পারিস ভূপতি তাহ'লে তোকে শুধু আমরা ভারতের অদ্বিতীয় ম্যাজিসিয়ান্ বলেই স্বীকার করবো না, তোর অনারে আমি ফিষ্ট্ দেবো।"

হাসতে হাসতে ভূপতি বললে—"কাজটা কি শুনি ?"

"শোন্, আজ সিণ্ডিকেটের মিটিং আছে। মিটিং ভাঙলে আমাদের ভাইস্-চ্যান্সেলার যখন আর সব সভ্যদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবে, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সকলের চোখে ধূলো দিয়ে বেমালুম যদি তুই ভাইস্-চ্যান্সেলারের পকেট থেকে কলমটা তুলে নিতে পারিস, তাহলে, এই দেখ দশ টাকার নোট্, তোকে অভিনন্দিত ক'রে আমি একটা ফিষ্ট্ দোবো ;"

ফিষ্টের নাম শুনে আদা ও সুধা একসঙ্গে বিকট একটা চীৎকার ক'রে উঠল'।

নরেশ বললে—"যদি তুই পারিস, ভূপু, আমি তোকে হাতীতে চাপিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাব।"

"আর আমি" তর্জনী বেঁকিয়ে ব্যাকাশ্যাম বললে—"তোর অনারে একটা রবিবার মাছধরা ছেড়ে, শুধু তোর নামেই ঢাক পিটিয়ে বেড়াব।"

ভূপতির কাঁধটা আদর করে চাপড়ে নলিন বললে—"কিরে পারবি ত ?"

ম্যাজিসিয়ান্ ভূপতি ডিপ্লোমাট্ নলিনের বিষবড়ি গিলে ফেললে। সে রাজি হ'য়ে গেল।

বন্ধুরা তিনবার তার নামে হুর্‌রে দিলে।

*   *   *   *   *

খুব একটা ঝোঁকের মাথায় ভূপতি ত রাজি হ'য়ে গেল।

কিন্তু সিণ্ডিকেটের মিটিং ভাঙতেই সভাগৃহের বড় দরজাটি যখন নিঃশব্দে খুলে গেল তখন ভূপতির বুকটা সশব্দে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রে উঠল'।

তারপর খোলা দরজা দিয়ে হোম্‌রা-চোম্‌রা সদস্যেরা যখন গজেন্দ্র গমনে বের হ'তে লাগলেন, আর তাঁদের মাঝখানে সহসা প্রকাশিত পর্বত চূড়ার মত ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মহোদয়ের মূর্তিখানি ভূপতির দৃষ্টিগোচর হ'ল, তখন সে একবার ভাবলে কাজ নেই এতটা দুঃসাহসে, পালাই। দু এক পা পেছিয়ে সে পালাবার উপক্রমও করছিল; হঠাৎ লাইব্রেরীর দিক্‌ থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"কাওয়ার্ড!" ভূপতি মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাইব্রেরীকক্ষে শেষ চেয়ারখানি দখল ক'রে নলিন একাগ্রচিত্তে একখানি স্থূলকায় গ্রন্থ পাঠ করছে; কেবল তার দুষ্টামি মাখান চঞ্চল দুটি চোখ বক্র দৃষ্টিতে ভূপতির ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করছে।

দলপতিটি যখন উপস্থিত আছে, তখন তার সঙ্গীরা নিশ্চয়ই আশে পাশে কোথাও লুকিয়ে থেকে তার দুর্বলতা লক্ষ্য করছে। ভূপতি ভাবলে, "এই শয়তানগুলোর কাছে পরাজয় স্বীকার করব'; কখনই না। যা থাকে কপালে, চেষ্টা করতে কিছুতেই আমি ছাড়ব না।"

কিন্তু এদিকে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ও তাঁকে ঘিরে সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ তখন সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেছেন; আর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলে তাঁরা সিঁড়ির ঐ বাকী কটা ধাপ নেমে গিয়ে যে যাঁর

গাড়ীতে চেপে বসে চম্পট দেবেন। ভূপতি আর দ্বিধামাত্র না করে সেই দিকে ছুটল'।

গ্রন্থ-পাঠের যবনিকা সরিয়ে নলিন ঝুঁকে পড়ে বড় বড় চোখ বের ক'রে দেখলে ভূপতি ভাইস্-চ্যান্সেলার মহোদয়কে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বেমালুম তাঁর চাপকানের পকেট থেকে কলমটি তুলে নিলে। তিনি তখন ইতিহাসের অধ্যাপকের কি একটা রসিকতায় হো হো ক'রে হাসছিলেন, কলম চুরির ব্যাপারটা মোটেই ধরতে পারলেন না।

কিন্তু ঐ যাঃ! পালাতে গিয়ে মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে পা পিছ্‌লে গিয়ে ভূপতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ভূপতিকে পড়তে দেখে তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে হাত দিয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব্যাপারটা চট্‌ করে বুঝে নিলেন।

আর ভূপতি সামলে উঠবার আগেই সেই পুরুষসিংহ সিংহবিক্রমে তার উপর লাফিয়ে পড়ে কলম সমেত তার হাতটা চেপে ধরে নিজের খাস-কামরার দিকে নিয়ে চ'ললেন। অপঠিত গ্রন্থখানিকে চোখের সামনে ধরে নলিন পুনরায় তাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা ক'রল'। বন্দী অবস্থায় লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ভূপতি লক্ষ্য করলে নলিনের সেই একাগ্রতা। রাগে তার দাঁতের উপর দাঁত ঘসে উঠল' চোখ দুটো উঠল' জ্ব'লে, কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে একটাও তিরস্কার বাণী বের হ'ল না। মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে সে চলে গেল। খোলা বইয়ের একখানা পাতার দিকে চেয়ে চেয়ে নলিন প্রার্থনা করতে লাগল',—"হে মা কালী, হাম্‌বাগ্‌টাকে এবারের মত ক্ষমা কর মা তোমার হাতের ঐ উদ্যত খাঁড়াখানি বেওয়ারিশ ছাগশিশু বলিয়া ভুল করিয়া এই নিরীহ মানবশিশুর ঘাড়ে যেন বসাইয়া দিও না মা।"

এই ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘ'টে গেল যে অন্যান্য পণ্ডিতপ্রবরেরা বিষয়টা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। তাঁরা সাধারণ কৌতূহলের বশে ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। ভূপতিকে ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে ভাইস্-চ্যান্সেলার বাহিরে বেরিয়ে এলেন। বাহিরে তখন বেশ ভিড় হয়ে গেছে। লাইব্রেরী থেকে ছাত্রেরা বেরিয়ে এসেছে, ইউনিভার্সিটির চাপরাশীরা ছুটে এসেছে, তার উপর সিণ্ডিকেট্-সভ্যদের মোটা মোটা চশমার ভেতর দিয়ে সেই ভ্যাবাচাকা খাওয়া চাহনিগুলি দেখে মনে হ'তে লাগল' ভূপতি এ যাত্রায় সহজে নিষ্কৃতি পাবে না।

ভাইস্-চ্যান্সেলারকে দেখে ভিড়টা চঞ্চল হ'য়ে উঠল'; তখন নানাজনে নানা প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। কেউ বলে ইংরাজীতে, কেউ বলে বাঙলায়; আবার সকলের কৌতূহলকে ছাপিয়ে গিয়ে দক্ষিণদেশীয় এক মহামহোপাধ্যায় যখন সংস্কৃতে প্রশ্ন করতে লাগলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা রীতিমত জটিল হয়ে উঠল'। কেউ বলে পিক্-পকেট্, কেউ বলে পকেট্মার, কেউ বলে চোর, কেউ বলে ডাকাত; আর সকলের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়ে দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিতের মুখে "তস্কর, তস্কর" ধ্বনি রীতিমত গর্জনের মত শোনাতে লাগল'।

এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্নে ভাইস্-চ্যান্সেলার কিন্তু ভ'ড়কে গেলেন না। তিনি প্রাণখোলা একটা হাসি হেসে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন; কেবল মুখে ব'ললেন,—"না, না, ব্যাপারটা কিছুই নয়; আমিই মিটিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।"

যে কৌশলী লোকটি কোন স্বাধীন দেশে জন্মালে একজন বড় ডিক্টেটার হ'তে পারতেন, ছোট একটা ভিড় ভেঙে দিতে তাঁর পক্ষ একটুও সময় লাগল' না। কিন্তু ঘরের মধ্যে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে

বসে তিনি আবার ডিক্টেটারী মূর্তি ধরলেন। ভূপতির মনের অবস্থা তখন পেনাল্টি-কিকের মুখে গোল-কীপারের মনের অবস্থার মত ধড়ফড় করতে লাগল'।

ভূপতির আপাদমস্তক একদৃষ্টে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"কি হে ছোক্‌রা, এ বিদ্যে কত দিন শেখা হ'য়েছে ?"

ভূপতির উপস্থিত-বুদ্ধিটা খুব খেলে, চট্ ক'রে একটা জবাব তার মাথায় এসে গেল।

ভূপতি বললে,—"সার, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রবেন ?"

"বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয় বিশ্বাস ক'রব'।"

ভূপতি উপক্রমণিকা থেকে আরম্ভ করলে,—"আমি আপনার ইউনি-ভার্সিটিরই একজন ছাত্র।"

"জানি, খেলোয়াড়দের একটা গ্রুপ ফটোতে তোমার চেহারা আমি দেখেছি।"

"আপনার স্মৃতিশক্তি অনন্যসাধারণ।"

"আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছি, অভিনয় করতে তোমায় বলিনি।"

"সার, মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার্ বলেছেন, এ সংসার-রঙ্গমঞ্চে সকল নর-নারী শুধু অভিনয় করতেই আসে।"

"মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার কি বলেছেন, সে কথা চুরি করে তোমাকে বক্তৃতা করতে বলা হয় নি ; তুমি আমার পকেট থেকে কলমটি চুরি করতে গেলে কেন এখন সেই কথাই বল'।"

ধমকানি খেয়ে ভূপতি মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে বলতে লাগল',—"কি জানি কেন আমার মনে হয় আপনার এই কলমটিতে এমন একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি লুকান' আছে, যার বলে যে কোন লোক

আপনার মত অসাধারণ পণ্ডিত হ'তে পারে। আজ তাই আপনার কলমটি চুরি করবার দুঃসাহস আমার হ'য়েছিল, কেবল আপনার মত পণ্ডিত হবার লোভে।"

ভূপতির কথা শুনে ভাইস্-চ্যান্সেলার কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে ঘরময় পায়চারী করলেন, তারপর ভূপতির সামনে এসে তার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে তিনি ব'ললেন,—"এ কথা তুমি বিশ্বাস কর ?"

"সর্বান্তঃকরণে।"

"তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারবে ?"

"কি প্রমাণ চান্, বলুন ?" ভূপতির কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠল'।

নিজের আসনটিতে বসে ভাইস্-চ্যান্সেলার কিছুক্ষণ কঠিনভাবে চিন্তা করলেন, তারপর ভূপতির মুখের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"তুমি ল কলেজে পড় ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন্ ইয়ার্ ?"

"ফার্ষ্ট ইয়ার্।"

"এই জুলাই এ প্রিলিমিনারী দিচ্ছ ?"

"ইচ্ছে আছে।"

"বেশ, এই জুলাই এ তোমাকে প্রিলিমিনারী ল দিতে হবে; আর সেই পরীক্ষায় যদি তুমি ফার্ষ্ট ক্লাস্ ফার্ষ্ট হ'তে পার তা হ'লে বুঝব' কলম চুরির যে কৈফিয়ৎ তুমি আজ আমাকে দিলে তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। চুরি করা তোমার উদ্দেশ্য ছিল না; মহত্তর কোনো উদ্দেশ্যে তুমি আমার পকেটে হাত দেবার দুঃসাহস করেছিলে।"

ভূপতি ভাবলে যাক্ আপাততঃ নিষ্কৃতি পেলুম।

ভাইস্-চ্যান্সেলার কিন্তু অত সহজে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন না।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'লতে লাগলেন,—"যদি তুমি ফার্ষ্ট হতে না পার, তা হ'লে বুঝব' তুমি একজন পাকা পকেটমার। আর আজকে তোমার চুরি ঢাকতে যে কৈফিয়ৎ তুমি দিয়েছ সেটা ত শুধু মিথ্যেই নয়, আমার পক্ষে যথেষ্ট অপমানকরও।"

ভূপতি মাথা হেঁট ক'রে শুনতে লাগল'।

"আর এই মিথ্যার আর অপমানের শাস্তি আমি কিভাবে দেব', শুনবে?" ভাইস্-চ্যান্সেলার নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন,—"তোমার পণ্ডিত হবার সখ চিরকালের জন্যে ঘুচিয়ে দেব' তোমার বি এ ডিগ্রী কেড়ে নিয়ে। আমার ইউনিভার্সিটি থেকে তোমায় দূর করে তাড়িয়ে দেব'; শুধু আমার ইউনিভার্সিটি নয়, ভারতবর্ষের আর কোন ইউনিভার্সিটিতে যাতে তুমি প্রবেশাধিকার না পাও, তারও ব্যবস্থা আমি ক'রব। আর শুধু এই করেই ক্ষান্ত হ'ব না। আজকের এই চুরির অপরাধে তোমাকে আদালতের সামনে হাজির হতে হবে। তোমার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দেব'। তারপর তোমার ভাগ্যে কি আছে সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি নিশ্চয় তোমার হয়েছে।"

তারপর ভূপতির নামধাম ও অন্যান্য বিবরণাদি লিখে নিয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার স্বহস্তে তার বুকে নিজের বড় সাধের ঝরণা-কলমটি গুঁজে দিলেন; দিয়ে বললেন,—"যদি যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে এর ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিচয় পাবে; আর আজ যদি তোমার মনের মধ্যে কিছুমাত্র ছলনা থাকে, তাহলে এই কলমই তোমাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে।...এখন যেতে পার।"

ভূপতি চলে যাচ্ছিল, ভাইস্-চ্যান্সেলার পিছু ডাকলেন,—"শোন।"

ভূপতি ফিরে দাঁড়াল'।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি, এই হচ্ছে আমার জীবনের মন্ত্র। আজ আমার কথাগুলিকে কেবল ফাঁকা আওয়াজ মাত্র ভেবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে তুমি ঠক্‌বে। সদয় হলে যেমন আমি অনেক কিছুই করতে পারি, তেমনি বিরূপ হলে আমার অসাধ্য কিছুই থাকে না।"

কম্পিতপদে ভূপতি যখন ভাইস্-চ্যান্সেলারের কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল, তখন ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং একেবারে নিস্তব্ধ জনশূন্য হয়ে গেছে। কেবল ওদিকের ঐ অন্ধকার বারান্দায় এক কোণে কে ও দাঁড়িয়ে! নলিন না? ভূপতি দেখেই বুঝতে পারলে, নলিনটা দুষ্ট হ'লেও মনটা তার উঁচু, এই বিপদে বন্ধুকে একলা ফেলে পালিয়ে যায়নি।

নলিনের চোখের সামনে ভাইস্-চ্যান্সেলারের সেই ঝরণা-কলমটি নাচাতে নাচাতে ভূপতি বললে,—"এই দেখ ট্রোফি জিতে এলুম। এবার কোথায় তোর ফিষ্ট্? জোগাড় কর। হাসি-বৌ-ঠাকৃরুণের হাতের রান্না অনেক দিন খাইনি যে রে।"

নলিন বললে,—"যদি তুই বলিস্ আজ রাত্রেই জোগাড় করি।"

"নিশ্চয়ই, এ আর বলতে, ষ্ট্রাইক্ দি আয়রন্ হোয়াইল্ ইট্ ইজ্ হট্, তা না হ'লে তোর যা ভোলা মন।"

"দেখ, ওরা সব বলাবলি করতে করতে চলে গেল যে আজ ভূপতির হার হয়েছে। কিন্তু ফিষ্ট্টা ওদের চাই।"

"তুই কি বল্‌লি?"

"আমি বল্‌লাম, ফিষ্ট তোমরা পাবে। কারণ ভূপতি যে ধরা পড়েছে, সেটা শুধু য়্যাক্‌সিডেণ্ট্। ওর সাহস আর ওস্তাদির পুরস্কার আমাদের দিতেই হ'বে।"

"বেশ; কিন্তু আজ রাত্রেই যদি আয়োজন করিস তাহ'লে ঐ পেটুকগুলোকে খবর দেবার সময় কোথা?"

"আরে তারা কি আর খবর দেবার অপেক্ষা রাখে এতক্ষণে সব আমারি ওখানে গিয়ে মোতায়েন হ'য়েছে।"

ভূপতি আদর ক'রে নলিনের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে—"শুধু তুই একা আমার জন্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস্? সম্পদে বিপদে এমন খাঁটি বন্ধু যে আমি আর কোথাও পাব না রে!"

ভূপতির বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নলিন বললে,—"যাঃ যাঃ আর খোসামোদ করতে হবে না। ফিষ্ট্ যখন দিচ্ছি, তখন বরাবরের মত এবারেও তোর সম্বন্ধে একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ত ক'রবই। জানি ত ওস্তাদিতে যেমন গিল্তেও তেমনি সব বিষয়েই তুই ফার্ষ্ট।"

"ফার্ষ্ট" কথাটা কাণে যেতেই একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভূপতির বুকটা কেঁপে উঠল'। তার হাসিভরা মুখখানি হঠাৎ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। অন্ধকারে নলিন সেটা লক্ষ্য করলে না।

সেদিন অনেক রাত অবধি বন্ধুরা নলিনের বাড়ীতে হল্লা করলে, হাসি-বৌ-ঠাকৃরুণের হাতের রান্না কাড়া-কাড়ি ক'রে খেয়ে। কিন্তু ভূপতি কিছুই খেতে পারলে না। যে ভূপতির ভোজনে এতটুকুও বৈরাগ্য কখন দেখা যায় নি আজ তারি জন্যে বিশেষ এ আয়োজনে একি তার পরিবর্ত্তন! বন্ধুরা বললে—, "ওটা চাল; ভাইস্-চ্যান্সেলারের কলম পকেটে গুঁজে দেমাকে আর ও দেখতে পাচ্ছে না।"

বন্ধুরা সব চ'লে যেতে নলিনকে একলা পেয়ে সব কথা বলে ভূপতি মনের ভার কতকটা হাল্কা করে ফেল্লে। নলিন বল্লে—"এর জন্যে আর ভয় কিসের? প্রিলিমিনারীতে ফার্ষ্ট হওয়া ত ভারী কথা; দুমাস

চেষ্টা করলেই হওয়া যায। জীবনে তোর এক মস্ত সুযোগ এসেছে, এটাকে হেলায় হারাসনি।"

"যদি এ যাত্রায় উদ্ধার পেতে পারি" যাবার সময় ভূপতি বলে গেল, "সে শুধু তোরি কল্যাণ-কামনায়।"

* * * * *

নলিনের পরামর্শ মত ভূপতি ছুটির আগে বাকী কটা দিন কলেজ যাওয়া বন্ধ করলে। নলিন প্রক্‌সি চালাতে লাগল'। শুধু কলেজ্ নয়, ভূপতি বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, খেলার মাঠ সব কিছু ছেড়ে দিলে; নলিন খবরদারী করতে লাগল'। দিনে রাতে এখন আর ভূপতির অন্য কোন কাজ নেই, কেবল পড়া আর পড়া; মাঝে মাঝে শুধু নলিন এসে তাকে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল'।

এমনি ভাবে প্রথম প্রথম কয়েক্‌টা দিন বেশ কাটল'। ভূপতির পড়া-শোনাও বেশ সন্তোষজনক ভাবে আগাতে লাগল'। কিন্তু ভূপতির অবচেতন মনের মধ্যে ভাইস্-চ্যান্সেলার সেদিন ভয়ের যে বীজটি পুঁতে দিয়েছিলেন, সেটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হ'য়ে ভূপতির স্বস্তির সৌধের ভিতরে ভিতরে শিকড় চালনা করে তাঁর গাঁথুনী দিন দিন শিথিল করে দিয়ে যাচ্ছিল। তাই জন্যে প'ড়তে প'ড়তে ভূপতির বুকটা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। ভূপতি খোলা বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে বসে,—"যদি ফার্ষ্ট হতে না পারি কি হবে?" বইয়ের পাতা খোলাই পড়ে থাকে, উদ্বেগ ও আশঙ্কায় ভূপতির মাথার মধ্যে সব ওলট্ পালট্ হয়ে যায়।

সেদিন মাঝরাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখে ভূপতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে স্বপ্ন দেখলে যেন সে এবার প্রিলিমিনারীতে ফেল্ ক'রেছে। ভূপতি ধড় মড় করে বিছানায় উঠে বসল'। ঘরের চারিদিকে তখন

জমাট্ অন্ধকার। ভূপতির মনে হ'লো অনাগত ভবিষ্যতের যত কিছু অন্ধকার আজ যেন তার অবচেতন মনের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে তার সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করে ফেলতে চাইছে।

সেই দিন থেকে ভূপতির মনের স্বস্তি একেবারে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। তার মুখের হাসি ও রাতের ঘুম দুই সে হারিয়ে ফেল্লে। পড়ার সময় সে দিলে অসম্ভব রকমে দীর্ঘতর করে। কিন্তু যতই সে পড়ার সময় দীর্ঘতর ক'রে দেয় ততই তার মনে হয় পঠিত বিষয় মনে করে রাখবার ক্ষমতা যেন তার লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

নলিন এসে আদর করে পিঠের উপর হাতটি রেখে ব'ললে,—"কি পাগলামি করছিস ?"

অসহায় শিশুর মত নলিনের বুকে মাথা রেখে ভূপতি বললে,—"নলিন ভাই বাঁচা, আর ত পারছি না।"

এই ভূপতির ছাত্রমহলে কেবল একজন ভাল খেলোয়াড় বলে নয়, একজন ভাল ছাত্র বলেও বেশ সুনাম ছিল। পরীক্ষাগুলোকে সে একটা খেলা বলেই মনে ক'রত; আর অবলীলাক্রমেই সে এযাবৎ সব পরীক্ষাগুলি পাশ ক'রে এসেছে। বন্ধুদের বিশ্বাস পড়াশোনায় ভূপতি যথেষ্ট পরিশ্রম করে না; একটু বেশী পরিশ্রম করলেই সে একজন বড় স্কলার বলে নাম করতে পারত'। সেই ভূপতির আজ এই পরিবর্তন দেখে নলিনের মনটা অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠল'; সে ভাবলে ভূপতির এই মানসিক বিপর্যয়ের জন্যে সেই সম্পূর্ণ দায়ী।

নলিন জোর করে ভূপতিকে ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেল। সেখানে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়ে, কত হাসির কথা বলে নলিন ভূপতির মনটাকে তাজা করে তুল্লে।

সেইদিন থেকে ভূপতি আর একদণ্ডও নলিনকে ছাড়তে চায় না। নলিন কাছে না থাকলে তার মনটা উদ্বেগ ও আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। নলিন কাছে এলে সে স্বস্তি বোধ করে। নলিন এসে বই পড়িয়ে শোনায় তবে ভূপতির পড়া হয়; নলিন এসে উৎসাহ দেয় তবেই ভূপতির আশঙ্কা দূর হয়। নলিন যেন বিশাল এক পর্বতের মত ভূপতিকে অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

নলিনও এবার প্রিলিমিনারী ল দেবার জন্যে তৈরী হ'চ্ছিল; ফিও সে যথাসময়ে জমা দিয়েছিল। কিন্তু ভূপতির জন্যে তাকে পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হ'ল। বাড়ীর লোকে নলিনের উপর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠল'। নলিনের কিন্তু আর অন্য উপায় ছিল না। ভূপতি জোর ক'রে তার স্বার্থের মুখে নলিনের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ালে।

* * * *

পরীক্ষার দিন সকালে।

নলিন এসে দেখলে যে বইয়ের স্তূপ এক পাশে সরিয়ে রেখে ভূপতি তারি জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছে।

নলিন আসতেই ভূপতি বলে উঠল',—"কি এত দেরী, আমি সকাল থেকে কেবল ছট্‌ফট্ করছি তোর জন্যে?"

"বাস্‌রে এত দরদ্" নলিন হাসতে লাগল'।

"আমি আজ আদৌ পরীক্ষা দিতে যাব কি না সেই সম্বন্ধে তোর কাছে একটা শেষ পরামর্শ চাই।"

"মানে?" নলিন ধমকে উঠল্'।

কাতর কণ্ঠে ভূপতি বললে,—"আজ সকাল থেকে আমার খালি মনে হচ্ছে, যা পড়েছি সব ভুলে গেছি, কিছুই মনে পড়ছে না। তাই ভাবছি পরীক্ষা দিতে যাওয়া শুধু ধৃষ্টতা মাত্র। তুই কি বলিস্ ?"

ভূপতির মাথাটা ধরে কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি দিতে দিতে নলিন বললে,—"বিদ্যেগুলো সব তলায় থিতিয়ে গেছে রে, একটু সেক্ দি বটল্ করলেই আবার সব ভেসে উঠবে।"

এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ভূপতি হেসে ফেল্‌লে। নলিনের বাহাদুরীই এইখানে। কিন্তু নলিন নিজে হাস্‌তে পারলে না। তার সামনে রয়েছে একটা কঠিন কর্তব্য ; ভূপতিকে শুধু পরীক্ষার হল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা নয়, তার মনে এমন সাহস এনে দিতে হবে যাতে সে ঠাণ্ডা মাথায় দুচার কলম লিখে আসতে পারে। তা না হ'লে, নলিনের এতদিনের হাঁটাহাঁটি, ভূপতির জন্যে যা কিছু স্বার্থত্যাগ সবই নিরর্থক হবে।

হঠাৎ নলিনের মাথায় একটা নূতন ফন্দি এল'।

নলিন বললে—"ভাইস্-চ্যান্সেলারের দেওয়া সেই ঝরণা কলমটি কোথায় ?"

"আলমারীতে তোলা আছে।"

"সেই কলমটি নিয়ে আজ তোকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে। মহাপুরুষের দেওয়া সেই কলম, তার মধ্যে অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক শক্তি লুকান আছে। তুই বিশ্বাস কর। ঐ কলম নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে, তোর ফার্ষ্ট হওয়া কেউ ঘোচাতে পারবে না।"

নলিনের কথায় ভূপতি অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেলে।

নলিন নিজের হাতে সেই কলমটি ভূপতির পকেটে গুঁজে দিয়ে তাকে পরীক্ষার হলে বসিয়ে দিয়ে এলো।

* * * * * *

পরীক্ষার ফল বের হবার অব্যবহিত পরের ঘটনা।

একদিন। রাত তখন এগারটা বেজে গেছে। খাওয়া শেষ করে শুতে যাবার আগে নলিন একবার তার পড়বার ঘরে এসেছিল একটা গল্পের বইয়ের সন্ধানে; হঠাৎ ঝড়ের মত ভূপতি এসে ঘরে ঢুকল'।

"কিরে ভূপু এত রাত্রে?"

"তোর কাছেই এলুম।"

"কি হুকুম বল।"

"আমাকে দুশোটা টাকা দিতে হবে, এখুনিই।"

"কি করবি তুই, এত রাত্রে দুশো টাকা নিয়ে?"

"এই দেখ।" ভূপতি নলিনের হাতে একখানা চিঠি দিলে।

চিঠিখানি পড়ে নলিন বল্‌লে,—"তুচ্ছ একটা কলম, তার মায়া এখনও ভুলতে পারে নি। বেশ ত বাপু কাল গিয়ে কলমটা ফেরৎ দিয়ে এলেই ত সব চুকে যায়।"

একটা শুখনো হাসি হেসে ভূপতি বল্‌লে,—"তুই ত সব কথাই জানিস্; আমার দুর্ভাগ্য অত সহজে মেটবার নয়।"

"ননসেন্স! তোর পাগলামি এখনও ছাড়েনি দেখছি।"

"এমন ভাগ্য-বিপর্যয়ের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মাথা ঠিক রাখতে পেরেছে এমন একটা উদাহরণ তুই দেখাতে পারিস?"

"পরীক্ষায় ফেল্ কি তুই একাই করেছিস্, আর কি কেউ কখন করে না?"

"করে ; কিন্তু তার ফলে কাউকে কখন এমন একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হয় না।···থাক্‌গে আমি তর্ক করতে আসিনি। দুশো টাকা আমার এখুনি চাই ; তোকে দিতে হবে ; না দিলে···।"

"ভয়ানক একট অনর্থ করে বসবি, না?···সত্যি ভূপতি তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

"তা গেছে।"

"কিন্তু টাকাটা নিয়ে কি করবি, তা ত বল্‌লি নি ?"

"পালাব।"

"কোথায় রে ?"

একটা শুষ্ক হাসি হেসে ভূপতি বল্‌লে—"ব'লে ক'য়ে পালাই ত পালাবার মানে কি হয় রে বোকা ? অ্যাবস্‌কণ্ডিং বলতে কি বোঝায় জানিস্ ত ?···আমি···"

বাধা দিয়ে নলিন বললে,—"সরি, আমি তার জন্যে টাকা দিতে পারব না।"

সোজা দাঁড়িয়ে উঠে ভূপতি বললে—"জানিস্ নলিন্, একটা খুন করলেও যা শাস্তি, দশটা করলেও তাই। তেমনি একটা চুরি করলে লোকে বলবে চোর, দশটা চুরি করলেও সেই সুনাম। তুই আমায় ঐ টাকাটা না দিলে আমি টাকাটা আজ রাত্রেই কোথাও থেকে চুরি করব'। চাই কি তোর বাড়ীতেও করতে পারি। তোর মত বন্ধু আর হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আর নেই ; পারিস ত সকাল উঠে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিস।"···ব'লেই যেমন সে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেছিল তেমনি ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল।

নলিন চট্ করে কি ভেবে নিলে ; তারপর দৌড়ে গিয়ে ভূপতিকে

ধরে এনে ঘরে বসিয়ে বল্‌লে,—"বড় সেণ্টিমেণ্টাল তুই ; ব'স্ এক কাপ্ চা ক'রে আনি খা।"

"না, না, এখনও অনেক হোটেল্ খোলা আছে, দুটো পয়সা ফেললে…"

"আঃ রাগ করছিস্ কেন ? টাকাও আমি এনে দিচ্ছি।"

ভূপতি নলিনের মুখের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে থেকে বললে,—"আমি জানি তুই দিবি। তুই আমার জন্যে যা করেছিস, জীবনে আমি কখন তা না পারব' ভুলতে, না পারব' শুধতে।"

"কিন্তু ভূপু তোকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

"কতক্ষণ ?"

"এই ধর ঘণ্টা খানিক।"

"ঘণ্টা খানিক ! কেন বল্ ত ?"

"সব ঘরের কথা তোকে বলে দোবো ?"

"কখন ত লুকোস্‌নি কিছু।"

"দেখ, আমার ট্রেজারার এখন এখানে নেই, বাপের বাড়ী গিয়ে ব'সে আছে। তাকে টেলিফোন্ করে আনিয়ে নিতে হবে। তা না হ'লে ত আমার হাতে বিশেষ কিছু নেই।"

ভূপতি একবার হেসে ফেলে গম্ভীর হ'য়ে গেল, বল্‌লে,—"এত রাত্রে বউদিকে টেলিফোন্ করে আনাতে গেলে তোর শ্বশুর বাড়ীতে যে একটা হট্টগোল পড়ে যাবে ?"

"কিছু না, সেটুকু সামলে নেবার মত বুদ্ধি তোর এই বন্ধুটির আছে।"

"মানে আমাকে শুধু নিমিত্ত মাত্র করা ; কিন্তু এতদিন বাপের বাড়ীতে থাকবার মানে ? রাগ হয়েছে বুঝি ?"

"আরে, রাগ করতে শিখলে ত বেঁচে যেতুম।··· ব'স্ আমি এখ্‌নিই টেলিফোন্ করে আসছি!"

*   *   *   *   *

এদিকে হাসি-বৌ-ঠাকরুণ তখন দুষ্ট নলিনের দোতলায় শোবার ঘরেই অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ঠেলে তুলে নলিন ব'ললে,—"ওগো, শিগ্‌গীর করে এক কাপ চা করে দাও ত।"

বউ-ঠাকরুণ ধড়মড় করে উঠে ব'ললেন,—"এত রাত্রে চা কে খাবে?"

প্রকাণ্ড বড় একটা হাঁ ক'রে, আঙ্গুল দিয়ে সেই 'হাঁটি' দেখিয়ে নলিন ব'ললে,—"আমি।"

নলিনের দুষ্টামি-মাখান রহস্যময় সেই মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও যখন কোন রহস্যভেদ করা গেল না, তখন বউ-ঠাকরুণ ফিক্ করে হেসে ফেললেন। তারপর হাসতে হাসতে ষ্টোভ্ জেলে চায়ের জল বসালেন।

সেই দেখে নলিন গেল ক্ষেপে, বললে,—"আচ্ছা তোমার এ সব কি সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বল' ত?"

বউ-ঠাকরুণ শঙ্কিতভাবে এদিক্-ওদিক্ দেখতে লাগলেন, কোথায় আবার ত্রুটি হ'ল।

নলিন আঙ্গুল দিয়ে তাঁর হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়ে ত্রুটি কোথায় দেখিয়ে দিলে আর ধমক দিয়ে বললে—"এত রাত্রে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে চায়ের জল গরম করতে বললে, মানুষের ত একটু রাগ হয় বাপু! তা নয় তুমি কি না বসে বসে হাসছ? আমার এই সব আন্ধারে পেটুক বন্ধুদের যে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াব, তা তোমার জ্বালায়

হবার জো নেই। তোমার ঐ 'হাসি' নাম রেখেই সব মাটি হয়েছে। সব কথাতেই মুখে হাসি লেগেই আছে।"

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোন রকমে হাসি থামিয়ে হাসি-বৌ-ঠাকরুণ বললেন,—"কানা ছেলের নামই লোকে পদ্মলোচন রাখে, জান না?"

"জানি" নলিন রেগে বললে,—"তাই ঠিক ক'রেছি এইবার ঐ হাসি নাম কেটে আমি তোমার নাম রাখব' মানময়ী।"

"তা হ'লে কাকে বেশী ভুগতে হবে জান?"

"যারা তোমায় 'ভারী লক্ষ্মী মেয়ে' বলে খোসামোদ ক'রে যখন তখন খাটিয়ে মারে, তাদেরকে।"

"তুমি বুঝি তাদের দলে নও?"

"আমি?" নলিন নিজের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে।

পাতলা ঠোঁটদুটি দাঁতে করে চাপতে গিয়ে হাসি বৌ-ঠাকরুণের যত হাসি দুষ্টামি-ভরা চোখ দুটিতেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল'। সেই চোখ দুটী নাচিয়ে বউ-ঠাকৃরুণ ব'ললেন, "হুঁ হুঁ"।

"আমি তখন তাদের দল ছেড়ে দিনরাত তোমার মানভঞ্জনের পালা গেয়েই কাটিয়ে দেব'।"

ভারী একটা সুন্দর জবাব বউ-ঠাকৃরুণের মনে এল' কিন্তু মুখ তুলে ব'লতে গিয়েই দেখেন যে তাঁর ঐ শিশুর মত দুষ্ট কর্তাটি ততক্ষণে তিন তলায় চ'লে গেছেন। তিন তলা থেকে তার গলা শোনা যাচ্ছে, "হ্যালো বড়বাজার……"

*　　*　　*　　*　　*

চায়ের কাপ্‌টিকে শেষ চুমুক দিয়ে ভূপতি বললে,—"আঃ প্রাণটা

জুড়িয়ে গেল। জানিস নলিন্ তোর বন্ধুত্বের কথা ভেবে আমার একটা কবিতা মনে পড়েছে—'যখন দেখিতে নারি অন্ধকার আসে'…"

হঠাৎ রাস্তায় একটা পরিচিত হর্ণ বেজে ওঠায় ভূপতির উচ্ছ্বাস মাঝখানেই থমকে গেল; চমক ভাঙবার আগেই ভূপতি চেয়ে দেখলে যে তাদের বাড়ীর গাড়ী থেকে তার দাদা আর বৌদি নেমে এলেন। তারপর বিনা ভূমিকায় দাদা যখন ঘাড়টি ধরে তাকে গাড়ীতে তুলে দিলেন তখন খেলোয়াড় ভূপতি বুঝতে পারলে সে কত শক্তিহীন। গাড়ী ছাড়বার আগে ভূপতি একবার কট্‌মট্ করে নলিনের দিকে চাইলে; নলিন জোড় হাত করে বললে—"মাইরী ভাই, অমন করে চাস্‌নে, আমার বুকটা তাহ'লে পুড়ে একেবারে কাঠ-কয়লা হয়ে যাবে।"

গাড়ী ছাড়তে ভূপতির বৌদি ব'ললেন,—"চল, বাড়ী গিয়ে এইবার তোমায় তালাচাবীর মধ্যে পূরবো। এত রাত্রে বন্ধুর বাড়ী এসেছ টাকা ধার করতে? কেন আমাদের কাছে চাইলে কি পেতে না?"

ভূপতির দাদা ব'ললেন—"এত রাত্রে হঠাৎ তোর দুশো টাকায় কি এমন দরকার হ'ল শুনি?"

ভূপতির হ'য়ে তার বৌদি জবাব দিলেন—"বোধ হয় সুভদ্রা হরণে যাবার জন্যে একটা রথ কেনবার দরকার হ'য়েছিল।"

ভূপতি কাঠ হ'য়ে বসে রইল', কোন কথার জবাব দিলে না।

* * * * *

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ভূপতি যখন নিজের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার বৌদি চুপিচুপি ঘরে ঢুকল' কাল রাত্রের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য খানাতল্লাসী করতে। তাঁকে বেশীক্ষণ গোয়েন্দাগিরি

করতে হ'ল না। বালিসের তলা থেকেই একখানা খোলা চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠিখানি পেয়ে বৌদি বড় মুস্কিলে পড়লেন, কেননা সেটি ইংরাজিতে লেখা। কিছুক্ষণ চিঠিখানি নেড়েচেড়ে বৌদি সেটি নিয়ে ছুটলেন নিজের ঘরের দিকে তার মর্মোদ্ঘাটন করতে ; কিন্তু পথিমধ্যেই শ্বশুরের সামনে ধরা পড়ে গেলেন।

"কিগো বৌমা এত ব্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছ কোথা ?"

বৌমা তখন চিঠিখানি তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে লুকোতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু বুড়ো শ্বশুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেটা এড়িয়ে গেল না।

বুড়ো ব'ললেন—"ওটা কি বৌমা ?"

পাছে নিজেকে কোন অন্যায় সন্দেহে পড়তে হয় তাই বৌমা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি বের করে শ্বশুরের হাতে দিয়ে ব'ললেন—"একখানা চিঠি আপনাকেই দেখাতে ত নিয়ে যাচ্ছিলুম।"

চিঠিখানি দিয়ে ফেলেই একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বৌমার বুকটা কেঁপে উঠল'।

চিঠিখানি ছোট। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলতেই বুড়োর মুখখানা খুসীতে ভরে গেল। শ্বশুরের মুখখানা দেখেই বুদ্ধিমতী বৌমা বুঝলেন যে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই।

বুড়ো ব'ললেন—"একবার ভূপতিকে ডেকে আন ত, বৌমা।"

কিন্তু বৌমার ডেকে আনবার তর সইল না। নিজেই তিনি 'ভূপু ভূপু' করে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রলেন।

অতঃপর কি করা উচিত সেই সমস্যা সমাধানের জন্যে ভূপতি তখন ছাদময় পায়চারী করছিল।

বাপের ডাকে রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে নেমে এল'। আসতে আসতে

দূর থেকে বাবার হাতে সেই চিঠিখানি আর বৌদির কৌতুকপূর্ণ চোখের চাহনি দেখে তার আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল' না। দূর থেকে বৌদির দিকে কটমট্ করে চাইলে যেমন করে কাল রাত্রে সে নলিনের দিকে চেয়েছিল। অবরুদ্ধ বুকের ক্রুদ্ধভাষা চোখ দুটো দিয়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু বৌদির তা দেখে ভয় খাবার জন্যে বয়ে যাচ্ছে।

ভূপতি কাছে আসতে তার বাবা ব'ললেন—"ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলার লিখেছেন তোমাকে এই চিঠি?"

বলেছি ত ভূপতির উপস্থিত বুদ্ধি অসাধারণ। এই একখানা ছোট চিঠির জন্যে তাকে কতই না জেরার মুখে পড়তে হ'ত, তাই সমস্ত মীমাংসা করে এক কথায় সে জবাব দিলে,—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি নাকি আমার জন্যে মফস্বলে একটা চাকরী ঠিক করেছেন, তাই এই জরুরী তলব।" ব'লেই ভূপতি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু বুড়ো বাপ সহজে ছাড়বার পাত্র নন্।

তিনি আবার প্রশ্ন ক'রলেন,—"কিসের চাকরী?"

"সে সব আমি কিছু জানি না।"

"তুমি কি চাকরীর জন্যে ওনাকে কিছু বলেছিলে?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তাঁর ইউনিভার্সিটিতে এত গ্র্যাজুয়েট্ থাকতে তোমার ওপরই তিনি এতটা সদয় হ'লেন কি করে?"

এই জেরায় ভূপতি বিরক্ত হ'য়ে উঠে ব'ললে,—"বোধ হয় এত গ্র্যাজুয়েট্দের ভেতর আমার মধ্যেই তিনি অসাধারণ কিছু একটা দেখেছেন।"

ভূপতির কথার এই ঝাঁজ বুড়ো বাপ ধরতে পারলেন না; কিন্তু

বৌদির নজর এড়িয়ে গেল না। তিনি আর চুপ করে থাকতে না পেরে ব'ললেন,—"তোমার মধ্যে অসাধারণটা তিনি কিসে দেখলেন, রূপে না গুণে ?"

শেষের কথাগুলি একটু আস্তে বলায় বুড়ো শ্বশুর শুনতে পেলেন না। "খেলার মাঠে ও একটু নাম করেছে, বোধ হয় তাই তাঁর সুনজরে পড়ে গেছে। তা বেশ চাকরীটা ভাল হলেই ভাল।" চিঠিখানি ভূপতির হাতে ফেরৎ দিয়ে বুড়ো বাপ ব'লতে লাগলেন,— "যথাসময়ে দেখা ক'রো, আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিও, তিনি যথার্থই মহৎ ব্যক্তি। ছাত্রদের এত বড় বন্ধু আর কি দ্বিতীয় আছে ?" তারপর ছেলের মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধ ব'ললেন,—"আমিও তোমায় আশীর্বাদ করছি বাবা, এই সূত্রেই যেন তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে।"

বাবা চলে যেতে ভূপতি বৌদিকে রীতিমত বক্তৃতা দেবার ঢঙে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'ললে,—"শোন' বৌদি, বাবা ত ব'লে গেলেন, এই সূত্রে যেন আমার ভাগ্য ফিরে যায়। আমার ভাগ্য সত্যই ফিরবে, কিন্তু কোনদিক্ দিয়ে জান ?"

বৌদি ব'ললেন,—"খুব জানি।"

"ছাই জান ; বাবাকে ত আমি মিথ্যে কথা বলেছি।"

"সে ত আর তোমার পক্ষে নতুন নয়।"

"আমার সর্বনাশ দেখে আহ্লাদ করা, সেও আজ তোমার পক্ষে নতুন নয় বৌদি, সেও আমি খুব জানি।"

"বেশ জান ত, আবার বলতে আসছ কেন ?"

"তোমার আহ্লাদ আরও একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে।"

রাগ করে বৌদি চলে যাচ্ছিলেন, ভূপতি বলে উঠল',—"রাগটা

একটু পরে ক'রলেই পারতে বৌদি, রাগাবার লোক এরপরে এ বাড়ীতে আর কাউকে পাবে না, বলে দিচ্ছি।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে বৌদি ব'ললেন,—"কেন এই অলক্ষণে কথা সব শোনাচ্ছ আমাকে?"

"শোনাচ্ছি সত্যি বলে। আজ আমার মাথার উপর যে ফাঁড়া এসে পড়েছে তা থেকে পরিত্রাণ ও তোমার শিবের বাবা এলেও করাতে পারবে না।"

"ফাঁড়া?" বৌদি চমকে উঠলেন।

ভূপতি অপ্রকৃতিস্থভাবে বলে যেতে লাগল',—"তাই জন্যে কাল আমি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। হয়ত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যেতুম। কিন্তু তুমি আর নলিন, যে দুজনের উপর আমি সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে এসেছি, তারাই সব চেয়ে বড বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে আমার সঙ্গে।"

বৌদি কোন প্রতিবাদ ক'রলেন না।

ভূপতি বললে,—"বেশ এই যদি তোমাদের বাসনা; আমাকে ধ্বংস করেই যদি তোমাদের এত আনন্দ; বেশ আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে, তোমাদের আনন্দ বর্ধন ক'রব'।"

বলেই বৌদিকে আর কিছু বলবার অবসর মাত্র না দিয়ে সে ছুটে চলে গেল। বৌদি পিছু পিছু ফটক অবধি ছুটলেন; অনেক কাকুতি মিনতি করলেন, কিন্তু কিছুতেই ভূপতিকে ফেরান গেল না। বৌদির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, তবু ভূপতি চেয়েও দেখলে না।

* * * * *

সকালে চা পর্যন্ত না খেয়ে ভূপতি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল'। সেদিন যেমন রোদ তেমনি গরম। ভূপতি সহরের রাস্তায় রাস্তায়

এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল’। সারা সহরের চন্‌চনে রোদ তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল, তবু সে যে কি ক’রবে সে সমস্যার কোন মীমাংসা হ’ল না। বেলা যখন প্রায় দুটো বাজে তখন উদ্‌ভ্রান্ত ভূপতিকে যেন কিসের আকর্ষণ ইউনিভার্সিটির ফটকের সামনে এনে হাজির করালে। মনের বিচার-শক্তি তার লোপ পেয়েছে। তবুও সে একটু ইতস্তত: করলে; তারপর একেবারে মরীয়া হয়েই ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের খাস কামরার প্রবেশ দ্বারে এসে যখন দাঁড়াল’ তখন তাঁর ঘরের ঘড়িতে টংটং করে দুটো বাজল’।

ঠিক্‌ দুটোর সময়ই তিনি দেখা করতে লিখেছেন। দুটো বাজতে, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে ভূপতিকে দেখে তার হাতখানি ধরে সজোরে নাড়তে নাড়তে ব’ললেন,—“ইউ আর ভেরী পাঙ্কচুয়্যাল্‌ ইয়ং ম্যান্‌।”

এই অতর্কিত সম্বর্ধনা ভূপতিকে এমন ঘাবড়ে দিলে যে একটা নমস্কার পর্যন্ত করতে সে ভুলে গেল।

ভূপতিকে নিজের টেবিলের পাশে বসিয়ে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার তাঁর চাপরাশীকে ডেকে হুকুম দিলেন, যেন একঘণ্টা কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। বড় আদামী কেউ এলে তাকে যেন মিটিং রুমে বসান হয়।

ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মহোদয় নিজের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ভূপতির দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ব’ললেন,—“আজ থেকে ঠিক চারমাস আগে, তুমি আমার পকেট থেকে একটা কলম চুরি করেছিলে সে কথা তোমার মনে আছে?”

ভূপতি বললে,—“আছে।” কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরল’ না; শুধু ঘাড়টাই নড়ে উঠল’।

“তোমার চেহারা এমন শুখনো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছিল?”

"না" ভূপতির কণ্ঠস্বর তেমনই ক্ষীণ।

"তবে কি আজকাল গাঁজাগুলির আড্ডায় দিনরাত কাটান হচ্ছে? বাড়ী গিয়ে স্নানাহার করবারও সময় পাওয়া যায় না?" ভাইস্-চ্যান্সেলার গর্জন করে উঠলেন।

ভূপতি শুধু ঘাড় নাড়লে, না কি হঁা, কি যে ব'ললে, কিছুই বোঝা গেল না!

ভাইস্-চ্যান্সেলার কিছুক্ষণের জন্যে একবার বাহিরে গেলেন, তারপর ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে একমনে একটা ফাইল খুলে, তার উপর নিজের হুকুম লিখতে লাগলেন।

মাথা হেঁট করে ভূপতি ভাবতে লাগল' যদি সে একবার এ যাত্রায় নিস্কৃতি পায় তা হ'লে কালীঘাটের বলির পাঁঠাগুলির জন্যে সে কিছুদিন সত্যাগ্রহ ক'রবে। আজ ঠিক এই সময়টিতে নিজের অবস্থার কথা ভেবে কালীঘাটের বলির পাঁঠাগুলির জন্যে হঠাৎ তার মনটা সমবেদনায় ভরে উঠল'।

ভাইস্-চ্যান্সেলারের চাপরাশী একটি বড় গেলাসে করে এক গ্লাস্ ঘোলের সরবৎ ও একঝুড়ি খাবার এনে ভূপতির সামনে টেবিলের উপর রেখে গেল। ভাইস্-চ্যান্সেলার একটিবার মুখ তুলে ভূপতির দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"খাও"।

ভোজনবিলাসী ভূপতির জীবনে বোধ হয় এই সর্বপ্রথম ভোজনটা একটা সমস্যা রূপে দেখা দিল। তবুও সে নিঃশেষ করেই সব খেলে। খাওয়া শেষ হ'লে ভাইস্-চ্যান্সেলার পাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন,—"বাথ্‌রুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এস।"

বাথ্‌রুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিতে দিতে ভূপতি ভাবতে লাগল',

—"বলির পূর্বে পাঁঠাগুলিকে পূজো করবার যে প্রথা আছে, তা বড়ই নিদারুণ।"

বাথ্রুম থেকে ফিরে আসতে ভাইস-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"ব'সো স্থির হয়ে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ভূপতি ব'সল'।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"আজ থেকে ঠিক চার মাস আগে একটা সর্তে কেবল সাময়িকভাবে তোমায় আমি মুক্তি দিয়েছিলুম, মনে আছে সে কথা ?"

"সে সর্ত আমি রাখতে পারিনি।"

"কেন ?"

"এই আপনার অপয়া কলমের জন্যে"—পকেট থেকে ভাইস্-চ্যান্সেলারের সেই ঝরণা-কলমটি বের করে সেটিকে তাচ্ছিল্যভাবে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে ভূপতি বললে এই কথা, একটি অস্বাভাবিক উত্তেজনার বশে। যে বিপদের আশঙ্কায় এতদিন ধরে ভূপতি একটা অসহ্য উদ্বেগ বহন করে আসছিল আজ সেই বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে তার এতদিনকার ভয়-ভাবনা কোথা দিয়ে উবে গেল! সে যেন বুকভরা সাহস নিয়েই সমস্ত বিপদ্ বরণ করে নেবার জন্যে রুখে দাঁড়াল'।

ভূপতির কথা শুনে ভাইস্-চ্যান্সেলারের মধ্যেও একটা উত্তেজনা দেখা দিল; তিনি দপ করে জ্বলে উঠে ব'ললেন—"কি ? আমার কলমকে তুমি অপয়া বল ? জান এর মর্যাদা, বোঝ এর শক্তি ?"

ভূপতি মাথা হেঁট করে আস্তে অথচ স্পষ্টভাবে বললে,—"কিছু আর জানতে বাকী নেই।"

ভাইস্-চ্যান্সেলার ক্রুদ্ধভাবে ঘরময় কিছুক্ষণ পায়চারী ক'রলেন,

তারপর ভূপতির সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর চোখ তুটি দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে।

ভূপতি ভাবলে, আজ বিনা অপরাধে আমি ভস্ম হ'য়ে যাব।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"একদিন সিণ্ডিকেটের মিটিংএ একজন সদস্যকে সই করবার সময় আমি আমার এই কলমটি আগিয়ে দিই; তিনি তুইহাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে ব'ললেন,—'আপনার কলম স্পর্শ ক'রব এত বড় ধৃষ্টতা আমার হবে না।' তবুও তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে শ্রদ্ধায় আমিও মাথা হেঁট করি।"

ভাইস্-চ্যান্সেলার নিজের চেয়ারে বসে পড়ে নিজের হাতে নিজের কলমটি তুলে নিলেন, নিয়ে ব'ললেন,—"যে কলম যুগ যুগ ধরে এই দেশে পূঁজা পাবার যোগ্য তুমি তার অমর্যাদা করেছ। সৈনিকের তরবারির অপমান করলে কি তার শাস্তি হয়, জান?" শেষের কথাগুলি বলতে বলতে তিনি গর্জন করে উঠলেন।

সমান ভাবে চীৎকার করে ভূপতি ব'লে উঠল'—"অপমানকারীকে এক কোপে কেটে তুখানা করে ফেলা হয়; এমন করে চুপিয়ে চুপিয়ে জবাই করা হয় না।"

ভাইস-চ্যান্সেলার ভূপতির জবাবে একটু চমকে গিয়ে তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। একটা দমকা হাওয়ায় আকাশের কালো মেঘখানাকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ভূপতির পিঠ চাপড়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"তুমি স্পোর্টস-ম্যান্ বটে; তোমার সাহস দেখে খুসী হলুম।"

একটি ড্রয়ার খুলে ভাইস-চ্যান্সেলার একখানা চিঠি বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, রেখে ব'ললেন,—"সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা

আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে। সিণ্ডিকেটের মিটিং স্থরু হবার অল্প একটু আগেই এই চিঠিখানি আমার হাতে এসে পড়ল'। চিঠিখানি পড়ছি, শোন।...

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমাদের এক দুঃসাহসিক বন্ধু বাজি রেখেছে, যে আজ আপনি যখন সিণ্ডিকেটের মিটিং শেষ করে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকবেন তখন সকলের সাক্ষাতে সে বেমালুম আপনার পকেট থেকে আপনার ঝরণা-কলমটি তুলে নেবে। আমাদের এই বন্ধুটি আপনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র; সে চোরও নয়, পকেট্‌মারও নয়। তাই আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, যে, সে যদি ধরা পড়ে তাহ'লে সে যেন আপনার কাছে ছাত্রের মত ব্যবহার পায়। চোর বা পকেট্‌মার ভেবে তাকে যেন মার খেতে আপনার চাপরাসীদের হাতে বা জেল খাট্‌তে পুলিসের হাতে দেওয়া না হয়। অবশ্য তার দর্পচূর্ণ করতে যতটুকু তিরস্কার করা দরকার তা অবশ্যই আপনি করবেন, কিন্তু প্রকাশ্যে নয় গোপনে।

যদি আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে কলমটি নিয়ে সে বেমালুম সরে পড়তে পারে, তাহলে পরের দিন আপনার কাছে আবার সেটি পৌঁছে দেওয়া হবে, অবশ্য আপনার অজ্ঞাতসারেই। এইভাবে কলম খোয়া গেলে কোন দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না। ইতি—

আপনার অনুগত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গোত্র
প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ছাত্র।"

চিঠিখানি পড়া শেষ হ'য়ে গেলে, ভাইস্-চ্যান্সেলার সেখানি ভূপতির হাতে দিয়ে ব'ললেন—"চিনতে পার, এ লেখা কার হাতের ?"

ভূপতি লাফিয়ে উঠল' হাতের লেখা দেখে,—"এ নলিনের লেখা। বিশ্বাসঘাতক আমার সেই বন্ধুটা আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই, আগে থেকে আপনাকে খবর দিয়ে রেখেছিল।"

শান্ত কণ্ঠে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"এই বন্ধুটি তোমার বিশ্বাসঘাতক নয়, অতীব বিচক্ষণ। সে কেমন ক'রে জানতে পেরেছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আমার সব কিছুর চেয়েও প্রিয়তম। তাই ছাত্র ব'লে তোমার এই পরিচয়-লিপি সর্বাগ্রেই সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পরিচয় আগে থেকে না পেলে সেদিনের ঘটনা অন্য রূপ নিত। কিন্তু ছাত্রদের কত আব্দার কত রকমেই যে আমি সয়ে এসেছি, তার একটুখানি পরিচয় দিতেই তোমাকে আজ এখানে তলব ক'রেছি।"

ভাইস্-চ্যান্সেলারের মনের দুয়ার একটুখানি ফাঁক হ'য়ে গেল। তারি ভিতর দিয়ে একটা বিশাল অন্তঃকরণের যতটুকু দেখা গেল, ভূপতি তাই দেখেই চমকে উঠল'।

শান্ত স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ভাইস্-চ্যান্সেলার বলে যেতে লাগলেন,—"এই চিঠিখানি পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ; ভাবলুম কার বুকের এমন পাটা যে আমার পকেট থেকে কলম তুলে নেবার সাহস করে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন বলে উঠল', এতখানি সাহস যার তার সাহসের মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে, নিজের হাতে আমার এই ঝরণা-কলম তাকে উপহার দিয়ে।"

ভূপতিটা বড় ভাবপ্রবণ। সামান্য একটু কারণে সে যেমন রেগে

উঠে, সামান্য কারণে সে যেমন ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ে, তেমনি সামান্য একটু আদরেই সে একেবারে গ'লে পড়ে।

ভাইস্-চ্যান্সেলারের শেষের এই কথাগুলির উত্তাপে তার মনের এতদিনকার সঞ্চিত ব্যথা ঝর্‌ঝর্ ক'রে গ'লে পড়তে লাগল' দুই চোখ দিয়ে। ভূপতি আর কিছুতেই মনের আবেগ চেপে রাখতে পারলে না, ভাইস্-চ্যান্সেলারের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে সে কেঁদে ফেল্‌লে, কাঁদতে কাঁদতে বললে,—"আমি নিতান্তই হতভাগ্য ; তাই আপনার কলমের মর্যাদা রাখতে পারিনি। আপনি ফিরিয়ে নিন আপনার কলম। আরও যোগ্যতর ভাগ্যবানের হাতে একে অর্পণ করুন, তিনি পারবেন এর মর্যাদা রাখতে।"

সস্নেহে মাথা নাড়তে নাড়তে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"একবার কন্যা সম্প্রদান ক'রে আর ত' তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।"

কলমটিকে চোখের সামনে তুলে ধ'রে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'লে যেতে লাগলেন,—"তোমার হাতে যখন দিয়েছি, তখন আমার এই মানসী কন্যার যোগ্য তোমাকেই হ'তে হবে, কঠিন শ্রম আর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের বলে।"

মাথা হেঁট ক'রে ভূপতি বললে,—"আমি চেষ্টা ক'রে দেখেছি ; আমার শক্তি নেই, সাহস নেই, আমি বড় দুর্বল।"

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"তুমি যদি নিজের শক্তিতে এর যোগ্য হ'তে না পার, আমি উপঢৌকন দিয়ে তোমায় যোগ্যতর ক'রে তুলব'।"

তারপর তিনি ভূপতিকে সস্নেহে তুলে সামনের চেয়ারটিতে বসালেন, টেবিল থেকে নিজের সেই ঝরণা-কলমটিকে তুলে নিয়ে

ভূপতির বুক পকেটে গুঁজে দিলেন আর একখানি সাদা কাগজ ভূপতির সামনে টেবিলের উপর মেলে দিয়ে ব'ললেন,—"এতে লেখ তোমার আবেদন। আমার এই কলম বুকে গোঁজবার যোগ্যতা অর্জন করতে যে উপঢৌকন তুমি চাও, নিঃসঙ্কোচেই তা তুমি লিখতে পার তোমার এই আবেদনে। সংসারে অসাধ্য সাধন করবার মত সাহস ও শক্তি আছে আমার এই বুকে।"

ভাইস্-চ্যান্সেলার আঙ্গুল দিয়ে নিজের বিশাল বক্ষখানি ভূপতিকে দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে গভীর চিন্তিতভাবে ঘরময় পায়চারী ক'রতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ভূপতির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ব'ললেন,—"হ'ল তোমার লেখা ?"

সসঙ্কোচে ভূপতি ব'ললে—"আজ্ঞে কি লিখতে হবে ?"

ভাইস্-চ্যান্সেলার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—"একটি আবেদন গো, একটি আবেদন,...নাঃ, লোকে যে বলে অমুকের গোয়াল, তা দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। একটা আবেদন লেখবার মত বিদ্যে যাদের হ'ল না, সেই সব বলদগুলোকে গ্র্যাজুয়েট্ করবার জন্যেই কি আমি আজীবন এই সাধনা ক'রে গেলুম। লেখ আমি ডিক্‌টেট্ করছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, একটা বানান ভুল হ'লে কি পাঙ্কুয়েসানের একটা ভুল হ'লে একঘণ্টা তোমাকে আমি ঐ লাইব্রেরীর হলের সামনে নীল্‌ডাউন করিয়ে রাখব'।"

ভাইস্-চ্যান্সেলারের ডিক্‌টেসান্ মত লেখা শেষ হ'লে ভূপতি বুঝতে পারলে যে এই আবেদনের বিষয় বস্তু হ'চ্ছে, সাগরপারে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মারফৎ প্রদত্ত এক দুষ্প্রাপ্য স্কলারসিপ্। সাধারণ অবস্থায় ভূপতির পক্ষে এ স্কলারসিপ্ পাওয়া ছিল স্বপ্নাতীত।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন,—"কি এই উপঢৌকন পেলে তুমি

আমার কলমের পূর্ণ মর্যাদা রাখতে পারবে? তুমি নিজেকে এই কলমের যোগ্য ক'রে তুলতে পারবে?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে ভূপতি মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল'; আনন্দে বিস্ময়ে তখন তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেছে, সে হাঁ, কি না, কিছুই বলতে পারলে না।

অভিভূত ভূপতির মাথার উপর নিজের কল্যাণময় হাতখানি রেখে ভাইস্-চ্যান্সেলার ব'ললেন, "এই স্কলারসিপের সঙ্গে আমার আশীর্বাদও আজ আমি তোমায় দিচ্ছি; আমার আশীর্বাদ কখন বিফল হয় না।"

রেণি ডে

জানলা-দরজার দুম্‌দাম্‌ শব্দে মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন বেশ ঝড় উঠেছে, বৃষ্টিও বেশ চেপে নেমেছে। মা উঠে জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ খড়খড়িগুলোর উপর ক্রুদ্ধ বৃষ্টির ধারাগুলি আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল'। ঘুম ত' গেল ভেঙে; আর মনের মধ্যে উঠল' একটা উৎকট আনন্দের ঢেউ। বাহিরের ঐ ঝড়-তুফান কোন্‌ ফাঁকে যেন আমার মনের মধ্যে এসেই নৃত্য সুরু ক'রে দিলে। সেই নৃত্যের তালে তালে মনের মধ্যে কেবল একটি কামনাই জেগে উঠতে লাগল', আজকের এই ঝড়বৃষ্টি কালকের স্কুলের ঘণ্টা শেষ না ক'রে যেন আর একটিবারও না থামে। কাছেই কোথাও বজ্রপাতের এক ভয়ঙ্কর শব্দে কানে যেন তালা ধরিয়ে দিলে। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ যেন আরও দাপাদাপি ক'রে উঠল'। শুনতে শুনতে আবার কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল' তখন ঝড়ের বেগ কমেছে কিন্তু বৃষ্টির বেগ একটুও কমেনি। জানলা দিয়ে দেখলুম বাড়ীর সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। কচিৎ একজন দুজনকে সেই জল ঠেলতে ঠেলতে একহাতে জুতো আর একহাতে ছাতা সামলে কোন রকমে যেতে দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টির বিরাম নেই, অবিরল ধারায় অসহায়-ভাবে আকাশ গ'লে পড়ছে। সেই অবিরাম বৃষ্টিধারায় স্কুলের পড়া হোম্‌টাস্কের আতঙ্ক ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেল। একেবারে সিদ্ধান্ত ক'রে বসলুম যে আজ আর আমাদের স্কুল বসবে না; আর যদিও বা এক দুঘণ্টার জন্যে বসে ত' সঙ্গে সঙ্গেই পাব' আমাদের সদা-ঈপ্সিত "রেণি ডে"।

ছুটীর নেশায় মন উঠল' ভ'রে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলুম। বৃষ্টির জন্যে আজ সকালে মাষ্টার মশায় এলেন না; কাজেই পড়বার ঝামেলা ছিল না। একমনে বৃষ্টি আর ঝাপসা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্ত সকাল কাটিয়ে দিলুম।

ঘড়িতে যখন ন'টা বাজল' তখন উঠতে হ'ল। এইবার স্নান সেরে স্কুল যাবার আয়োজনের একটা ভাণ ক'রতে হবে। অভিভাবকেরা বৃষ্টির দরুন যেতে নিষেধ না করা পর্যন্ত ত' নিজের মুখে স্কুলে যাব' না বলা যায় না; এখন উঁচু ক্লাশে উঠেছি।

কিন্তু সংসারে বোধ-বিবেচনা কা'রোরই নেই। ভাত খেতে খেতে দেখলুম বৃষ্টি একেবারে ধ'রে এল'।

মা ব'ললেন,—"বাঁচা গেল, বের'বার সময় তবু পোড়া বৃষ্টি একটু থামল'।"

কাকাও আমার সঙ্গে খেতে ব'সেছিলেন, তিনি ব'ললেন,—"দেখ ত' বৌদি রাস্তার জল স'রেছে কি না।"

মা দেখে এসে ব'ললেন,—"ধাঙ্গড়গুলো ড্রেন খুলে বসে আছে, একটু দাঁড়িয়ে যাও ; জল এখুনিই স'রে যাবে।"

আমি শেষ আশা আঁকড়ে ধ'রলুম, হয়ত রাস্তার জল এত শীঘ্র যাবে না ; তখন মাকেই ব'লতে হ'বে—"খোকা আজ আর তোর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।"

কিন্তু সে আশায়ও আমার ছাই প'ড়ল'। মার কথাই ফ'লল। সওয়া দশটা বাজলে রাস্তার সব জল স'রে গিয়ে পীচের রাস্তা ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল'। যাবার সময় মা হেসে ব'ললেন,—"যা, যা এইবেলা চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়। সকাল থেকে আমি ভগবানকে ডাকছি যেন বের'বার সময় এ দুর্যোগ কেটে যায়। দেখলি ত' আমার ডাক কেমন ভগবানের কানে গিয়ে পৌছল'।"

মার কথা শুনে আমার সমস্ত রাগ বৃষ্টির উপর থেকে মার উপর গিয়ে প'ড়ল। আমি ব'ললুম—"তুমি কিছুই জান না মা। বৃষ্টি না হ'লে কি সৃষ্টি থাকবে ? ফসল না হ'লে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হ'বে সে কথা কি তুমি জান, না তোমার ভগবান্ জানে! এসব কথা আমাদের বইয়ে লেখা আছে। সে সব কথা প'ড়লে তুমি বুঝতে পারতে অসময়ে বৃষ্টিটা থামিয়ে তুমি দেশের কি ক্ষতিই না ক'রলে।"

মা কি বুঝলেন মাই জানেন, শুধু হেসে ব'ললেন—"অতশত কি আমি জানি রে, আমি মুখ্‌খু মানুষ। কিন্তু তুই আর দাঁড়াসনে, লক্ষী আমার, চাকরটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আবার হয়ত এখুনিই অন্ধকার ক'রে আসবে।"

মায়ের তাগাদায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে বই বগলে বেরিয়ে প'ড়তে হ'ল। রাস্তায় যেতে যেতে নারাণের সঙ্গে দেখা। দেখলুম সেও কম

রেগে নেই। আমাকে দেখে বললে,—"দেখলি সুবোধ, বৃষ্টির আক্কেলখানা, ঠিক স্কুল যাবার মুখেই থেমে গেল।"

নারাণের মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে আকাশের এক জায়গায় খানিকটা মেঘ কেটে গিয়ে রোদের আলো দেখা দিল'। ধোয়া চকচকে পীচের রাস্তায় সেই ঝকঝকে রোদের আলো যেন একটা নিষ্ঠুর উপহাসের হাসি হেসে উঠল'। নিতান্ত হতাশ ভাবে নারাণ বললে,—"দেখছ, এর মধ্যে আবার রোদও উঠে গেল, তবে আর রেণি ডে হবার কোন আশাই নেই।"

এমন একটা নিশ্চিত 'রেণি ডে' লোকসান্ হওয়ার দুঃখ আমারও কম ছিল না; তাই সমবেদনার সুরে ব'ললুম,—"রোদ যখন উঠে গেছে, আর কি 'রেণি ডে' দেবে!"

খুব রেগে গিয়ে নারাণ ব'ললে,—"চুলোয় যাক্ গে 'রেণি ডে' এখন নাড়ুগোপাল বাবুর ক্লাশে যে কি করে বাঁচব', তাই ভাবছি।"

আমাদের অঙ্কের মাষ্টারকে আমরা পিছনে ঐ আদরের নামটি দিয়েছিলুম। তাঁর ক্লাশে হোম্‌টাস্ক ক'রে না নিয়ে গেলে তিনি কাউকে আস্ত রাখতেন না। কারণে অকারণে নিত্য আমরা যে কড়া আদর তাঁর কাছ থেকে পেতুম তারি বিনিময়ে ঐ আদরের নামে আমরা তাঁকে অভিহিত ক'রতুম, অবশ্য নিতান্ত সঙ্গোপনে নিজেদের মধ্যে। প্রকাশ্যে তাঁর মুখের উপর কথা ব'লবার সাহস আমাদের কারোরই ছিল না।

নারাণের কথা শুনে আমারও ভয় হ'ল, ব'ললুম,—"বলিস্ কি, বাড়ীর অঙ্ক করিসনি?"

নারাণ ভেংচে উঠল',—"টিফিনের পরের ঘণ্টা অঙ্কের। কেন ক'রব? সকাল থেকে এঁচে রেখেছি, আজ একটার সময় "রেণি ডে" হবে। তুই ক'রেছিস?"

আমি ব'ললুম,—"হাঁ ভাই, আমি কাল রাত্রেই অঙ্কগুলো ক'ষে রেখেছি ; ভাগ্যিস ক'রেছিলুম ! আমার ভাই গ্রামার মুখস্থ হয়নি।"

নারাণ তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে—"ধেৎ ধেৎ নিত্যানন্দ বাবুকে আবার ভয়। যা-হ'ক একটা বুঝিয়ে দিবি। কিন্তু নাড়ুগোপাল বাবুর হাতে আজ আর আমার নিস্তার নেই।"

কথা কইতে কইতে আমরা স্কুলে পৌছে গেলুম। আমি সোজা ক্লাশে গেলুম কিন্তু নারাণ গেল না। স্কুল বাড়ীর পেছনে ছোট একটা গলির মত আছে, সে দেখলুম তার মধ্যে ঢুকে গেল।

সেদিনকার প্রথম ঘণ্টা ছিল, নিত্যানন্দ বাবুর গ্রামারের ক্লাশ। রোল্ কলের পর নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"কি পড়া আছে দেখি।"

একটি ছেলে উঠে ব'ললে,—"সার, আজ বাদলার দিনে পড়তে ইচ্ছে নেই, একটা গল্প বলুন।"

নিত্যানন্দ বাবু পড়ার চেয়ে গল্পই ভালবাসেন বেশী। ইতিহাসের গল্প, দেশ-বিদেশের বড়লোকদের জীবনের গল্প ইত্যাদি কত গল্প যে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

নিত্যানন্দ বাবু ক্লাশে অন্য ছেলেদের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"কি রে কারোরই পড়বার ইচ্ছে নেই না কি ?"

সকলে বলে উঠল',—"না সার, না সার।"

আমার দিকে চেয়ে তিনি ব'ললেন,—"কিরে তোর কি মত ?"

আমি ব'ললুম,—"সার, আজ সকালে মাষ্টার মশায় আসেন নি ব'লে আমার পড়া হয়নি।"

অমনি ক্লাশে এখান ওখান থেকে কলরব উঠল',—"আমারও, আমারও।"

নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"আচ্ছা তবে আজ পড়া থাক, গল্প হ'ক।" অমনি ক্লাশে একটা সাড়া প'ড়ে গেল; সকলে পটাপট্ বই বন্ধ করলে গল্প শোনবার জন্যে।

নিত্যানন্দ বাবু আরম্ভ ক'রলেন,—"মানুষ বড় হ'য়ে ওঠে কাজের মধ্যে দিয়ে নয় অবসরের মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সত্যটা কিভাবে ফুটে উঠেছে, আজ সেই গল্প তোদের বলব'।"

ঠিক এমনি সময় ভিজে ঢোল হ'য়ে নারাণ ঘরে ঢুকল'। তার জামা কাপড় দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল ঝরছে, ভিজে চুল থেকে মুখের চারদিক্ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ঠিক যেন সে এইমাত্র কোন পুকুরে ডুবে এল, নয়ত মাথায় কয়েক বালতি জল ঢেলে এল, এমনি ধারা তার চেহারাটা দেখতে হ'য়েছে। তাকে দেখে ত' হো হো করে একটা হাসি প'ড়ে গেল। কেবল হাসলেন না নিত্যানন্দ বাবু, তাঁর মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে গেল।

তিনি ব'ললেন,—"একি ব্যাপার নারাণ?"

নারাণ কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'ললে,—"সার, ভিজে গেছি।"

"তা এখন কি ক'রতে হবে?"

"সার রাস্তায় আসতে আসতে......"

বাধা দিয়ে নিত্যানন্দবাবু ব'ললেন,—"ভিজে গেছ তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। কেমন ক'রে ভিজলে সে কথা শুনে ত' কিছু লাভ নেই। ভিজে যখন গেছ তখন কি করতে চাও তাই বল'।"

নারাণ নিতান্ত ভালমানুষের মত বললে—"স্যার ভিজে জামাকাপড় প'রে সারাদিন থাকলে জ্বর হবে।"

"বেশ তবে বাড়ী গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে এস।"

নারাণ আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে,—"সার, আবার মেঘ ক'রে আসছে।"

"বেশ ত' আবার বৃষ্টি আসে, আর এসনা।"

"বাবা যদি জিজ্ঞেস করেন ?"

"বোলো, আমি তোমায় ছুটি দিয়েছি।"

আর কোন কথা নয়, ছুটি পেয়ে নারাণ বাড়ীর দিকে ছুটল'।

নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"কাল রাত্রে কি ঝড় বৃষ্টিই না গেল। এ বছর এত বৃষ্টি আর কোনদিন হয়নি।"

একটি ছেলে উঠে বললে,—"সার, আজ রবীন্দ্রনাথের গল্প থাক, একটা বাদলার গল্প বলুন।"

"বাদলার গল্প ? কি জানিস বাদলা এলেই আমার রবীন্দ্রনাথকে মনে প'ড়ে যায়।"

একটি ছাত্র বললে,—"সার, কাল রাত্রে যখন ঝড় উঠেছিল তখন আপনার ঘুম ভেঙ্গে গেছল' ?"

"শুধু ঘুম ভাঙা ! সারারাতই ত আমি জেগে ব'সে।"

"কেন সার ?"

"কাল রাত্রে যখন ঝড় উঠল', তখন জানলা দরজার দুম্‌দাম্ শব্দে আমার ঘুম গেল ভেঙে। উঠে সব বন্ধ ক'রে ত' আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুলুম।"

একটি ছেলে বাধা দিয়ে বলে উঠল',—"আপনার বাড়ী কোথায় সার ?"

"তোদের গরিব মাষ্টার বাড়ী কোথায় পাবে বল ? একটা মেসবাড়ীতে তিনতলার ছাদের উপর একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি।"

"ছাদের উপর ঘর ভাড়া নিলেন কেন সার ?" একজন বললে।

"আমি নির্জনতা ভালবাসি ব'লে।"

"নির্জনতা কেন ভালবাসেন সার ?" আর একজন জিজ্ঞেস করলে।

"কেন জানিস্, আমি কবিতা লিখতে না পারলেও মনে মনে আমি কবি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমি যখন আকাশভরা তারা দেখতে পাই, তখন মনে হয় আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় এ জগতে আর কেউ নেই।"

আমি ব'লে উঠলুম,—"সার, কাল রাত্রে আপনার ঘরে ছাদ দিয়ে জল পড়েছিল ?"

"সহস্রধারায়। সে এক কাণ্ড। প্রথমে এক ফোঁটা জল পড়ল' মুখের ওপর, তারপর পায়ের ওপর, তারপর সারাগায়ে, তারপর সমস্ত বিছানায় এখানে ওখানে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল প'ড়তে লাগল'। বিছানা গেল ভিজে। সেগুলিকে এককোণে জড়' ক'রে রেখে টেবিলের ওপর গিয়ে শুলুম। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর জল প'ড়তে সুরু হ'ল। টেবিল থেকে নেমে, ঘরের একটা কোণ একটু শুখনো ছিল, সেখানে গিয়ে শুলুম ; সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও জল প'ড়তে লাগল'। তারপর ঘরের আর কোথাও বাদ রইল না, পট্‌পট্‌ পট্‌পট্‌ এখানে ওখানে চতুর্দিকে জল প'ড়তে লাগল'। দেওয়ালের গা দিয়ে চারিদিকে ঝরণা নামল', মেঝেতে জল দাঁড়িয়ে গেল। যখন দেখলুম ঘুমের সব আশাই চলে গেল ; তখন আমি চারিদিকের জানলা দরজা খুলে দিলুম। ঘরের মধ্যে তখন ঝড় আর বৃষ্টির তুফান বইতে লাগল'। আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলুম,—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর জীবনে এমন এক সময় গেছে, যখন বর্ষা তাঁর জীবনের উপর রাজত্ব ক'রেছে, আমি দেখলুম আমার জীবনে একটা রাত্রি বর্ষা আমার

উপর রাজত্ব ক'রে গেল। তবে সেই রাজত্ব রবীন্দ্রনাথের মত প্রজানুরঞ্জনের নয়, কঠিন শাসনের।"

শেষের কথাগুলি তিনি এমন স্বরে ব'ললেন, যে ক্লাশশুদ্ধ হাসি প'ড়ে গেল। হাসি থামতে না থামতে ঘণ্টা বেজে গেল। গ্রামারের ঘণ্টা শেষ হ'য়ে গেল। নিত্যানন্দ বাবু উঠে ব'ললেন,—"আচ্ছা, আজ ঐ পড়াই রইল'। পরের দিন যেন আর গল্প শুনতে চেওনা। আমি জানি আজ সকাল থেকে তোরা 'রেণি ডে' আশা ক'রে বসে আছিস, পড়াশোনা কেউ কিছু করিসনি; হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টিটা থেমে গিয়ে তোদেরকে বড্ড ফাঁকি দিয়ে গেল, না রে?" ব'লেই হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন।

বৈকালে বাড়ী ফেরবার সময় রাস্তায় আবার নারাণের সঙ্গে দেখা। নারাণ আমাকে দেখে ত হেসেই খুন, বললে—"দেখলি ত', নিত্যানন্দ বাবুর চোখে কেমন ধূলো দিয়ে ছুটি বাগিয়ে নিলুম। লোকটা মাইরী কি বোকা রে! আমরা যখন স্কুলে যাই, তখন রাস্তায় জল কোথা, সব ত শুখিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। বাবা সত্যিই বলেন যে পাঁচ বছর মাষ্টারী ক'রলে আর কোর্টে তাদের সাক্ষী নেয় না। তা উনি ত' আজ ত্রিশ বছর ঐ কাণ্ড ক'রছেন। এই ত্রিশ বছর ধ'রে উনি প্রোনাউন্ সাত প্রকার ক'রে এলেন, ত্রিশ বছর ধস্তাধস্তি ক'রেও তাকে আট প্রকার ক'রতে পারলেন না। ওঁদের আর কি হবে বল?... কিন্তু যাই বল, বুড়োগুলোকে ঠকিয়ে ভারি আরাম আছে। হাঁ কি না বল্?"

আমি হাঁ কি না কিছুই ব'ললুম না, দেখে নারাণ যেন বিরক্ত হ'য়ে যাচ্ছিল, আমি ডাকলুম—"শোন।"

সে ফিরে এসে ব'ললে,—"কি ?"

"কিন্তু তুই অমন ক'রে ভিজলি কি করে, আমার সঙ্গে ত দিব্যি শুখনো স্কুলে ঢুকলি ?"

"সে কথা তোকে বলব' কেন, আমার বিদ্যে তুই শিখে ফেলবি।" ব'লেই বুক ফুলিয়ে সে গট্‌গট্‌ ক'রে চলে গেল।

দেখে আমার মোটেই ভাল লাগল' না ; কারণ স্কুলে আমি আর সব মাষ্টারকে ভয় করি কিন্তু নিত্যানন্দ বাবুকে ভালবাসি।

পরের দিন সকাল ন'টার সময় আবার চেপে বৃষ্টি এল'। কিন্তু আগের দিন ঠ'কে বৃষ্টির ওপর আর আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। মনে মনেই ব'ললুম, যতই চেপে এস, আজ আর তোমার ছলনায় ভুলছি না। ঠিক হ'লও তাই, বেরবার সময় বৃষ্টি থেমে গিয়ে চারিদিক্ শুখনো হ'য়ে গেল। ক্ষুণ্ণ মনে বই বগলে স্কুলে গেলুম। আজ যেতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ক্লাশে যাচ্ছি দেখি নারাণ আজও কালকের মত ভিজে ঢোল হ'য়ে হল্ থেকে বেরুচ্ছে।

আমি ব'ললুম,—"কিরে আজও ভিজে গেছিস্ ?"

নারাণ একবার পিছনের দিকে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে ব'ললে,—"মাইরী আজও নিত্যানন্দ বাবুকে বাগিয়েছি। আজও আমার 'রেণি ডে', বাড়ী চ'ললুম ; তোরা যা ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিগে যা।"

আমি অবাক্ হ'য়ে ব'ললুম,—"নিত্যানন্দ বাবুকে আজ পেলি কোথা, আজ ত আমাদের প্রথম ঘণ্টা হেড্ মাষ্টারের ?"

"তুইও যেমন ! হেড্ মাষ্টারের কাছে এসব চালাকী চ'লবে ? আমি খুঁজে খুঁজে নিত্যানন্দ বাবুকে বের ক'রলুম, সটাং গিয়ে ব'ললুম,

সার আজও ভিজে গেছি। তিনিও সটাং ব'লে দিলেন, বেশ তবে আজও বাড়ী যাও; আজও তোমার রেণি ডে।"

"মাইরী, কি লাকী তুই!"

"লাকী? ব্রেন, শুধু এমনি একখানা ব্রেন থাকা চাই। বলে বুদ্ধির্যস্য...সংস্কৃত আর আওড়াব না, আমি ত' ও বিষয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর।"...ব'লেই সে দিল ছুট।

ক্লাশে গিয়ে দেখি হেড্ মাষ্টার ব'সে আছেন, ক্লাশ নিস্তব্ধ। তিনি একে একে পড়া ধ'রছেন। দেরী ক'রে যাওয়ার জন্যে আমাকে জুতো খুলে দশ মিনিট বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হ'ল। আমার যেতে দশ মিনিট্ দেরী হ'য়েছিল।

দশ মিনিট্ হ'য়ে যেতে আমি সবেমাত্র অনুমতি নিয়ে ব'সেছি এমন সময় ঝড়ের মত নারাণকে ধাক্কা দিয়ে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নারাণের বাবা ক্লাশে ঢুকলেন।

সামনেই হেড্ মাষ্টারকে দেখে ব'ললেন,—"এই যে হেড্ মাষ্টার মশায়, আজ না কি আপনাদের 'রেণি ডে', স্কুল ছুটী হ'য়ে গেছে?"

"না ত' এই ত' দিব্যি ক্লাশ হ'চ্ছে।"

"তবে যে আমার গুণধর ছেলে গিয়ে ব'ললে, আজ স্কুলের 'রেণি ডে', স্কুল ছুটী হ'য়ে গেল। হেড্ মাষ্টার মশায় আসেন নি, কোন মাষ্টারই আসেন নি, কেবল নিত্যানন্দবাবু এসেছেন আর তিনি সব ছেলেদের ছুটী দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

হেড্ মাষ্টার মশায় নারাণের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"কিরে এইসব কথা বাড়ীতে গিয়ে বাবার কাছে ব'লেছিস?"

নারাণ মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল', কোন কথার জবাব দিলে না।

নারাণের বাবা আবার জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কালও কি আপনাদের 'রেণি ডে' গিয়েছিল আর ১১টার সময় ছুটী হ'য়েছিল ?"

হেড্ মাষ্টার মশায় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ব'ললেন,—"দিব্যি চারটে অবধি সমানে ক্লাশ হ'য়েছিল।"

"আর আমার গুণধর ছেলে গিয়ে ব'ললেন, স্কুলে ছেলেরা কেউ আসে নি, সব ক্লাশ মিলিয়ে মাত্র ১০।১২ জন হয়ত ছেলে এসেছে ; মাষ্টার মশায়দের মধ্যে এক নিত্যানন্দ বাবু ছাড়া আর কেউ আসেন নি। তাই স্কুল আর বসল' না, ছুটি হ'য়ে গেল।"

হেড্ মাষ্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে নাবাণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর গম্ভীর গলায় ব'ললেন—"কি ? এসব কি শুনছি ?"

নারাণ তেমনি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল', হাঁ কি না, কিছুই ব'ললে না।

হেড্ মাষ্টার মশায় তার কানটা ধ'রে ব'ললেন,—"এমন ক'রে ভিজলি কি ক'রে ?"

নারাণ জবাব দিলে না ; দিলেন তার বাবা—"এই কথা বলে কে ? আপনার স্কুল থেকে আমার বাড়ী তিন মিনিটের রাস্তা। আমার বাড়ীর ছাদের ওপর যখন রোদ উঠছে তখন আপনার স্কুল-বাড়ীতে এমন ঝড়-তুফান্ চ'লছে যে ছেলে আমার স্কুল বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে ভিজে ঢোল হ'য়ে যাচ্ছে।"

"নারাণ, সত্যি কথা বল্"—হেড্ মাষ্টার আরও একটু গম্ভীর গলায় ব'ললেন,—"কোথায় এমন ক'রে ভিজলি ?"

নারাণ নীরব।

"ভাল মুখে জিজ্ঞেস ক'রছি, ভাল চাও ত' কথার জবাব দাও।"

নারাণ নীরব।

"জবাব দাও।" হেড্ মাষ্টার গর্জন ক'রে উঠলেন।

সমস্ত ক্লাশ নিস্তব্ধ। নারাণ নীরব।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল।

"ভাল কথার ছেলে ওসব নয়, ওদেরকে খুন ক'রলে তবে মনের রাগ যায়।" ব'লেই নারাণের বাবা সজোরে নারাণের কোমরে একটা লাথি মারলেন। নারাণ ছিট্‌কে ক্লাশ থেকে হলের মাঝখানে গিয়ে প'ড়ল'।

"আহা—হা" ব'লে হেড্ মাষ্টার দৌড়ে গিয়ে নারাণকে তুলে এনে একটা বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিলেন, দিয়ে নারাণের বাবার দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"দেখুন, এটা স্কুল, আপনার বাড়ী নয়। আপনার বাড়ীতে আপনি আপনার ছেলেকে খুন ক'রতে পারেন কেউ দেখতে যাবে না; কিন্তু স্কুলে ছেলে যতক্ষণ থাকবে সে আমার অধীন, আমার ছাত্র। আমার স্কুলের কোন ছাত্রের গায়ে হাত তোলবার অধিকার আপনার নেই। সে আপনি বাপই হ'ন আর যেই হ'ন।"

ঠিক এই সময় ঘণ্টা বেজে গেল। পরের ঘণ্টা নিত্যানন্দ বাবুর। তাঁর আগের ঘণ্টাটা ফাঁকা ছিল ব'লে তিনি একটু আগে থেকেই হলের মাঝখানে অপেক্ষা ক'রছিলেন। হঠাৎ নারাণের মার দেখে ও হেড্ মাষ্টার মশায়ের চীৎকার শুনে তিনি তাড়াতাড়ি ক্লাশে ঢুকে এলেন এবং নারাণের বাবা হেড্ মাষ্টার মশায়ের কথার জবাব দেবার আগেই তাঁকে তাড়াতাড়ি ক্লাশ থেকে নিয়ে গেলেন। হলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে নিত্যানন্দ বাবু তাঁকে কি বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু বোঝবার লোক তিনি নন, হল্ থেকে বেরবার আগে তাঁর তীব্র

কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“বেশ আপনাদের নিয়ম অনুসারেই চ’লবেন ; কিন্তু চারটের আগে ওকে স্কুল কম্‌পাউণ্ডের বাইরে যেতে দিলে, আমি লিখব’ ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ্ স্কুলে, আপনারা স্কুলের শৃঙ্খলা রাখতে জানেন না, এই অভিযোগ ক’রে।”

নিত্যানন্দ বাবু ফিরে আসতে হেড্ মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস ক’রলেন, —“ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ্ স্কুলের কি ভয় দেখাচ্ছিলেন উনি ?”

“ওনার মাথা খারাপ, যেতে দিন না ওসব কথা। ব’ললুম স্কুলের চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে যান, ছেলের একটা শুখনো জামাকাপড় পাঠিয়ে দেবেন।”

“হুঁা, তা কি ব’ললে ?”

“ব’ললে, ‘না ওই ভিজে জামাকাপড়েই ও সারাদিন থাকুক, অমন ছেলে ম’রলে ত’ আমার হাড় জুড়োয়।”

ব’লেই নিত্যানন্দ বাবু একেবারে হো হো ক’রে হেসে উঠলেন।

হেড্ মাষ্টার মশায় মৃদু হেসে ব’ললেন,—“আশ্চর্য মেণ্ট্যালিটি।”

“এক একজনের থাকে ওই রকম।”

“কাল এই ক্লাশের প্রথম ঘণ্টা আপনার ছিল। আপনি জানতেন নারাণ কাল কাকেও কিছু না বলে স্কুল পালিয়েছিল ?”

“না, আমিই ওকে বাড়ী যেতে ছুটি দিয়েছিলুম।”

“ও ! আর আজকে ?”

“আজও আমি ওকে বাড়ী যেতে ছুটি দিয়েছি।”

“কেন ?”

“ওর জামাকাপড় ভিজে গেছল’ ; সারাদিন ভিজে জামাকাপড়ে স্কুলে থাকলে ওর জ্বর হ’তে পারে, তাই।”

"কেন জামাকাপড় ভিজলো আপনি একটু খোঁজ নিলেন্ না কেন ?"

"আমি নিজের চোখেই দেখেছি যখন তখন আর খোঁজের কি দরকার !"

"কি দেখেছেন।"

একটু হেসে নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"দেখি কি, ও স্কুলে ঢুকেই ক্লাশে না গিয়ে গলির দিকে যায়। আমি ভাবলুম, তাই ত' কোথায় যায় ও ! পেছু পেছু গিয়ে উঁকি মেরে দেখি যে ও সটাং যেখানে ছাদের নল দিয়ে ছরছর করে জল পড়ছে তার তলায় গিয়ে দাঁড়াল'।...কি নারাণ, ঠিক দেখেছি কিনা ?"

নিত্যানন্দ বাবুব কথা শুনে নারাণ একবার চমকে উঠেছিল ; এইবার তাঁর প্রশ্নে নারাণ আর মুখ তুলে চাইতে পারলে না। মাথা হেঁট করে রইল'।

হেড্ মাষ্টার মশায় কট্মট্ ক'রে নারাণের দিকে একবার চেয়ে ব'ললেন,—"দুদিনই আপনি ওকে এমনি ভাবে ভিজতে দেখেছেন ?"

"দুদিনই !"

"তবু আপনি ওকে ছুটি দিয়ে প্রশ্রয় দিলেন ?"

"ছুটি না দিলে, একটা মিথ্যায় হ'ত না আরও দশটা মিথ্যার আশ্রয় ওকে নিতে হ'ত নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ ক'রতে। অভিসন্ধি যখন সহজে সিদ্ধ হ'য়ে যায় তখন আর মিথ্যে বলবার দরকার হয় না। মিথ্যে কথা বলবার প্রথম বাধাটাই সবচেয়ে বড় ; সেটা যখন মানুষ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, তখন আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমি ওকে এই প্রথম মিথ্যে কথা বলার পাপ থেকে রক্ষা ক'রেছি মাত্র।"

"আপনি কি বলতে চান ইতিপূর্বে উনি আর কখন মিথ্যে কথা বলেন নি ?"

"আমি ত' কখন বলতে শুনিনি। শুধু নারাণ কেন, আমার কোন ছাত্র আমার সামনে কখন মিথ্যে কথা বলে না।"

"সত্যি কথা ব'লেও যদি রেহাই পাওয়া যায় ত' মিথ্যে বলবার দরকার কি ?"

মৃদু হেসে নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"ওই কথাই ত' আমি সব সময় এদের বলি।"

"এই ক'রেই আপনি এদের মাথা খাচ্ছেন।"—বলেই হেড্ মাষ্টার মশায় রাগে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলেন।

নিত্যানন্দ বাবু বয়সে অনেক বড়; তাঁকে হেড্ মাষ্টার মশায় রীতিমত খাতির করেন, তাই মুখের উপর কিছুই ব'লতে পারেন না। কিন্তু হেড্ মাষ্টার মশায় তাড়াতাড়ি রাগ ক'রে চ'লে যাবার সময় নারাণটা যে ভিজে জামাকাপড়ে বসে রইল', সেকথা বোধহয় একেবারে ভুলে গেলেন।

হেড্ মাষ্টার মশায় চ'লে গেলে, নিত্যানন্দ বাবু তাড়াতাড়ি বোর্ডে একটা টাস্ক লিখে দিলেন :—ফিল্ আপ্ দি ব্ল্যাঙ্কস্ ইত্যাদি······লিখে ব'ললেন,—"তোমরা চুপচাপ এই টাস্কটি ক'রতে থাক, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

ব'লেই তিনি হন্‌হন্ ক'রে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলেন ও একটু পরেই একটা নূতন কাপড় আর একটা নূতন জামা নিয়ে ক্লাশে ফিরে এলেন। সেগুলি নারাণের হাতে দিয়ে ব'ললেন,—"ভিজে জামাকাপড়-গুলি ছেড়ে ফেল্।"

নারাণ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"কেন আপনি কষ্ট ক'রে এসব

কিনতে গেলেন ? পাখার হাওয়ায় আমার ত' জামাকাপড় এখুনিই শুখিয়ে যেত।"

"ও ! তবে যে তুই এই একটু আগে আমার কাছে ছুটি নেবার সময় ব'ললি, ভিজে কাপড়ে থাকলে তোর জ্বর হয়।"

ক্লাশে একটা হাসি প'ড়ে গেল।

লজ্জায় নারাণ আর কোন কথা না ব'লে, নিত্যানন্দ বাবুর কিনে-আনা জামা ও কাপড় তাড়াতাড়ি প'রে ফেললে, আর ভিজে জামাকাপড়গুলো পুঁটুলী বেঁধে ঘরের এক কোণে রেখে দিলে।

নিত্যানন্দ বাবু ব'ললেন,—"বাড়ী যাবার সময় ওগুলো যেন. ভুলে রেখে যাস্‌নি।"

মাথা হেঁট ক'রে নারাণ শুধু বললে,—"না।"

নিত্যানন্দ বাবু নারাণের মাথার উপর হাত রেখে ব'ললেন,—"তোর মা নেই, না নারাণ ?" নারাণ কোন কথা ব'ললে না। নিত্যানন্দ বাবু আবার ব'ললেন,—"তাই তোর বাবা তোকে অমন ক'রে মারলেন। মা না থাকলে, অনেকক্ষেত্রে দেখেছি, ছেলেদের উপর বাপের দরদ চ'লে যায়।"

কথাটা সামান্য ; কিন্তু আমরা সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম এই দেখে যে, এই কথাতেই নারাণ একেবারে কেঁদে ফেললে। আমরা আরও আশ্চর্য হ'লুম এই জন্যে যে নারাণকে এর আগে আমরা কখনও কাঁদতে দেখিনি। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে আর দুরন্তপনায় স্কুলে নারাণের জুড়ি নেই। শিক্ষক মহাশয়দের বিব্রত ক'রতে, স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙতে নারাণের মাথায় কখন যে কি কৌশল খেলত' আগে থেকে তার কিছুই ধ'রবার উপায় ছিল না। তার সেই সব কৌশল যখন ধরা প'ড়ত তখন তার শাস্তিরও সীমা থাকত' না। এক এক সময় দেখেছি শিক্ষক মহাশয়ই

তাকে মারতে মারতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তবুও নারাণের চোখে কখন কেউ জল দেখেনি। পদ্মের পাতায় যেমন জল দাঁড়ায় না তেমনি তার গায়ে 'মার' 'অপমান' 'লজ্জা' কখন লেগে থাকতে পারত' না। এই একটু আগে দেখা গেল নারাণ হেড্ মাষ্টার মশায়ের হাতে যার পর নাই মার খেলে; আর একটু পরেই দেখা গেল যে সে হাসি মুখে ছুটছে নূতন আর একটা কিছুর মতলবে। এই ত' ওর বাবা ওকে অমন ক'রে মেরে গেলেন, দেখে আমাদের চোখে জল এল', কিন্তু ওর চোখ দুটো যেন মরুভূমি—জলের লেশমাত্র নেই। এ হেন নারাণকে নিত্যানন্দ বাবুর সামান্য একটা কথায় একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে আমাদের সত্যিই বড় আশ্চর্য ঠেকতে লাগল'।

নিত্যানন্দ বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নারাণের কান্না দেখলেন, তারপর একটু হেসে ব'ললেন,—"কি বাবা নারাণ, নর্দমার জলে ভিজে 'রেনি ডে' পাওয়া গেল না ব'লে, এবার চোখের জলে ভিজে আর একবার সেই চেষ্টা করা হবে বুঝি ?"

ক্লাশে আবার একটা বিরাট্ হাসির রোল উঠল'।

নারাণও হেসে ফেললে।

তখন চোখের জলের উপর তার মুখের হাসি এমন একটা শোভা নিয়ে ফুটে উঠল' যে আমরা না দেখলে কেউ বিশ্বাসই ক'রতে পারতুম না, নারাণের দুরন্ত ঐ মুখখানির মধ্যেও এত শোভা লুকান' থাকতে পারে।

কাউন্সিলার্

মাঘ মাসের একটি কনকনে শীতের রাত্রে প্রায় এগারটার সময় সহরের কোন জনবহুল ওয়ার্ডের কাউন্সিলার্ সারাদিনের একটানা পরিশ্রমের পর নরম বিছানার উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে, সর্বাঙ্গে বেশ ক'রে লেপ মুড়ি দিয়ে, যখন অস্ফুট একটু "আঃ" ব'লে ধ্বনি ক'রলেন, তখন কাউন্সিসার্-পত্নী আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না ; একটু ঝঙ্কার দিয়েই ব'লে উঠলেন,—"হ'ল ? সারা দিনের দিগ্বিজয়ের পালা সাঙ্গ হ'ল ?"

অন্য সময় হ'লে কাউন্সিলার্ মহোদয় এর একটা বেশ সরস জবাব দিতে পারতেন কিন্তু এখন তাঁর চোখের পাতা দুটি অত্যন্ত ভারী হ'য়ে উঠেছে ; গিন্নীর তিরস্কার কানের মধ্যে ঢোকবার আগেই তিনি তন্দ্রাভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন।

এমন সময় দরজা খোলার ক্যাঁচ ক'রে একটু শব্দ হ'ল। ঐটুকু

শব্দেই কাউন্সিলারের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখলেন, দরজার পাশে তাঁর চাকর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কি রে?"

বাবু জেগে আছে দেখে চাকরটি ঘরের ভিতর এসে বাবুর হাতে একটি কার্ড দিলে, দিয়ে বললে,—"যেতে বলব?"

জবাব দিলেন কাউন্সিলার্ গিন্নী বেশ একটু ঝাঁঝাল সুরে,—"হাঁ, যেতে বলগে, একটু যদি তোদের আক্কেল বুদ্ধি থাকে! রাত এগারটা বাজে এখনও লোক আসার বিরাম নেই। ওঁর শরীরটা শরীর নয়, পাথরের তৈরী, না?"

কাউন্সিলার্ এতক্ষণে লেপ ছেড়ে উঠে ব'সেছেন; তিনি চাকরকে ব'ললেন,—"বাবুকে বসাও, আমি আসছি।" চাকর চ'লে গেলে, গিন্নীকে ব'ললেন,—"ইলেক্‌শন্ সামনে, এখন একটা ভোট্ও অবহেলা করা যায় না। না হয় এগারটা বেজেছে; ইলেক্‌শন্ জিততে হ'লে অমন কত রাত জেগেই কাটাতে হয়।"

কাউন্সিলার্ গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন,—"তাই ত', আমি দিনরাত ভগবানকে ডাকছি, এবার যেন ইলেক্‌শনে তোমার হার হয়।"

এদিকে নীচে বসবার ঘরের সামনে আজানুলম্বিত ওভারকোটের পকেটে হাত দুটি ঢুকিয়ে নাগানন্দ বাবু পায়চারী ক'রছেন; মুখে একটা সিগার। ইনিই এইমাত্র কার্ড পাঠিয়ে কাউন্সিলার্ মহোদয়ের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালেন।

কাউন্সিলার্ নীচে নেমে এসে অভ্যর্থনা জানালেন—"হ্যালো, মিষ্টার্ নাগানণ্ড্!"

নাগানন্দ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হাত দুটি বের ক'রে বাঁ হাতে

সিগার আর ডান হাতে কাউন্সিলারের হাত ধ'রে সজোরে করমর্দন ক'রলেন।

দুজনে ঘরে ব'সলে, নাগানন্দ ব'ললেন,—"ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ? অসময়ে এসে বিরক্ত ক'রলুম ?"

"কিছু না। তোমাদের সঙ্গলাভের চেয়ে কি আমার আহার-নিদ্রা বড় ?"

"এইবার নিয়ে বোধ হয় আজ পাঁচবার আপনার বাড়ীতে আমার আসা হ'ল, শেষে অধ্যবসায়েরই জয় হ'ল, আপনার দেখা পেলুম।" ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, কাউন্সিলার্ মহোদয়ও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। শীতের কনকনে রাত দুজনের সেই প্রাণখোলা হাসিতে গরম হ'য়ে উঠল'।

হাসি থামলে নাগানন্দ ব'ললেন—"কাল-পরশু সরস্বতী পূজোর বন্ধ; তার পরের দিন আবেদন-দাখিলের শেষ দিন; তাই আজই আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ দরকার। আপনি এখনও আবেদন করেন নি ?"

"হাঁ আজ ক'রে দিলুম। পাঁজীতে দেখলুম কি না, আজ দিনটা খুব ভাল।"

এই কথায় নাগানন্দের মুখখানি একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল; কিন্তু তিনি সেভাব গোপন ক'রে ব'ললেন—"আপনি এবার একাই সব ভোটগুলিই ক্যাপচার্ ক'রে ফেলবেন; আপনার মত এত জনপ্রিয় কাউন্সিলার্ ত' আর কেউ নেই।"

কথাটা শুনে কাউন্সিলার একেবারে আপ্যায়িত হ'য়ে গেলেন। এক মুখ হেসে ব'ললেন—"আমাকে তোমার বাবা যেমন স্নেহ করেন, তোমরাও তেমনি ভালবাস। তোমাদেরই জোরে আমি তিন তিনবার

ইলেক্‌শনে দাঁড়াতে পেরেছি। এবারও যে দাঁড়াচ্ছি সেও শুধু তোমাদের ভরসায়।"

নাগানন্দ ব'ললেন—"শুধু আমরা নই, এ ওয়ার্ডে সবাই আপনাকে চায়। তাই দিনের মাথায় পাঁচ সাতবার হতাশ হ'য়ে ফিরে না গেলে, আপনার দেখা পাওয়া যায় না।"

আবার একচোট্ হো-হো ক'রে হাসি উঠল'।

কাউন্সিলার ব'ললেন—"সত্যি নাগানন্দ, এর জন্যে তোমার কাছে আমাকে মাপ চাইতে হয়।"

নাগানন্দ ধমকে ব'ললেন—"কি যে বলেন?"

"তবু সারাদিন আমাকে যে কি চরকী ঘোরা ঘুরতে হ'য়েছে, তা যদি শোন, আমার ওপর নিশ্চয় তোমার কোন রাগ বা অভিযোগ থাকবে না।"

"তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। শুধু কি আজ? আজ ন বছর ধ'রে ত' দেখছি; বিশ্রাম শব্দটা আপনার অভিধান থেকে মুছে ফেলা হ'য়েছে।"

"আর তার বিনিময়ে কি পেয়েছি জান?"

"অসাধারণ লোক-প্রিয়তা।"

"না, অসাধারণ অখ্যাতি।" একটু জোর দিয়ে কাউন্সিলার্ ব'ললেন।

নাগানন্দ এটাকে একটা কৌতুক মনে ক'রে হাসলেন।

"বিশ্বাস হ'ল না? তবে শোন;—আজ সকালে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট্ কমিটির মিটিং ছিল সাড়ে সাতটায়; আরম্ভ হ'ল নটায়। বড্ড রাগ হ'ল; কাজ সুরু হবার আগেই আমি একটা বক্তৃতা ক'রতে উঠলুম সভ্যবৃন্দের সময়জ্ঞানের এই লজ্জাকর অভাবের বিরুদ্ধে। অমনি

পেছন থেকে কে ব'লে উঠল', পাঁচজনের মন যুগিয়ে যাদের চলতে হয় পাংচুয়ালিটি শুধু তাদের জন্যেই। বিরক্ত হ'য়ে ব'সে পড়লুম।"

"কে একথা ব'ললেন?"

"নামটা নাই শুনলে। বাপের অগাধ পয়সা আছে, তারই জোরে হ'য়েছেন কাউন্সিলার্। বিদ্যাবুদ্ধি যা আছে তাতে মাতৃভাষা শুদ্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে পারেন না।"

"গণতন্ত্রের পরিণাম।"

"ছিঃ ছিঃ, মাঝে মাঝে এমন ঘৃণা ধরে! কিন্তু মোহ এমন যে ছাড়তেও পারি না।"

"বাবাও আজ সকালে এই কথা ব'লছিলেন।"

"হাঁ! কি ব'লছিলেন?"

"ব'লছিলেন, আপনার স্বাস্থ্যটা আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ; আপনি অকাজে অবহেলায় সেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলছেন। এতে দেশের প্রতিই অবিচার করা হ'চ্ছে বেশী। আমি ব'ললুম, উনি যা ক'রছেন তাও ত' দেশের আর দশের কাজ। বাবা ব'ললেন—তাই ব'লে কাউন্সিলারী ক'রেই যদি উনি জীবনটা কাটিয়ে দেন, তা হ'লে দেশের ক্ষতিই হ'বে সব চেয়ে বেশী। কাউন্সিলারী ক'রতে ত' আমরাও পারি, আমাকে ব'ললেন; কিন্তু আপনি জন্মেছেন আরও বড়, আরও মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে।"

"তা আমি বুঝতে পারি নাগানন্দ।" গদগদ ভাষায় কাউন্সিলার্ ব'ললেন।

নাগানন্দ ব'ললেন—"তাই ত', বাবা আমাকে পাঠালেন, 'তুমি যাও, ওনার আশীর্বাদ নিয়ে এবার ইলেক্‌শনে দাঁড়িয়ে পড়; আর ওনাকে জীবনের সেই মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের একটা সুযোগ দাও'।"

এতক্ষণে কাউন্সিলার্ বুঝতে পারলেন, কেন নাগানন্দ আজ পাঁচবার তার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি ক'রেছে, একটিবার তাঁর দেখা পাবার জন্যে। কিন্তু তিনিও চালাক লোক, স্পষ্ট ক'রে কিছুই খুলে ব'ললেন না।

এই বিষয় নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের মধ্যে আলোচনা চ'লল। কেউই স্পষ্ট ক'রে মনের কথা খুলে ব'ললেন না, কেবল অস্পষ্ট হেঁয়ালীর মধ্যে দিয়ে একে অপরকে ইঙ্গিত ক'রতে লাগলেন। নাগানন্দের বক্তব্য বিষয়,—"আপনি ত' নয় বৎসর ভোগদখল ক'রলেন, এইবার্ আমাকে সুযোগ দিন, আর আমার হ'য়ে একটু ক্যান্ভাসিং করুন।" কাউন্সিলার মহোদয়ের বক্তব্য বিষয়—"কাউন্সিলারী অতি জঘন্য কাজ, কোন স্নেহাস্পদের হাতে এই বিষবড়ি আমরা স্বহস্তে তুলে দিতে পারি না।" নাগানন্দ যদি বলেন,—"দেশের যুবকদের উচিত এই কণ্টকের মুকুট বৃদ্ধদের মাথা থেকে নিয়ে স্বেচ্ছায় নিজেদের মাথায় পরা।" কাউন্সিলার্ অমনি বলেন—"দেশের যুবকেরা যদি অকালবার্ধক্য প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে সংসার আমাদের মরুভূমি হ'য়ে উঠবে ; আর যাদের মুখ চেয়ে আমরা সংসারের সকল দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যাচ্ছি, তারাই আমাদের পরম দুঃখের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

এইভাবে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা ক'রেও যখন হেঁয়ালীর অস্পষ্টতা কাটল' না, তখন নাগানন্দ ফিরে গেলেন, একটা "হাঁ না"র মধ্যে দুলতে দুলতে ; আর কাউন্সিলার্ মহোদয় শয্যা গ্রহণ ক'রলেন একটা অপ্রত্যাশিত দুশ্চিন্তায়।

দুশ্চিন্তায় সারারাত কাউন্সিলার্ মহোদয় ঘুমোতে পারলেন না। কারণ নাগানন্দের বাবার যেমন নাম আছে, পয়সাও আছে তেমনি অগাধ।

পরের দিন সকালেই কাউন্সিলার্ মহোদয় নাগানন্দের বাবার কাছে ধর্ণা দিলেন। বৃদ্ধ মহানন্দ বাবু অগাধ টাকার মালিক, কিন্তু তিনি অপব্যয় পছন্দ করেন না। শুধু ভোট্ ভোট্ ক'রে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা নষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী নন; অথচ ছেলে উপযুক্ত হ'য়েছে, তার মুখের উপর না বলবার সাহসও তাঁর হয় না, পাছে ছেলে বিগড়ে যায়।

কাউন্সিলার্ মহোদয়কে খাতির ক'রে বসিয়ে বৃদ্ধ মহানন্দ ব'ললেন —"হাঁ নগেনের বড্ড সখ হ'য়েছে একবার দাঁড়ায়, কিন্তু আপনারা থাকতে ওকি পাত্তা পাবে?"

কাউন্সিলার ব'ললেন—"বলেন কি? নগেন আমার ছোট ভায়ের মত, সে দাঁড়ালে আমি কি তার সঙ্গে কন্‌টেষ্ট্ ক'রতে পারব?"

"আপনি যদি স'রে দাঁড়ান তা হ'লে ত' ও আন্‌কন্‌টেষ্টেড্ দাঁড়িয়ে যাবে। আর ত কেউ ক্যাণ্ডিডেট্ নেই।"

"নাগানন্দের ফেভারে আমি এখুনিই স'রে দাঁড়াতে পারি, যদি আপনি ব'লতে পারেন যে আপনি আপনার পুত্রকে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিয়েছেন, এই দূষিত জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে নামতে।"

বৃদ্ধ মহানন্দ পলিটিক্সের নামে বাঘের মত ভয় পায়। কাজেই কাউন্সিলারের কথায় তাঁর মনটা কেঁপে উঠল'। মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে তিনি ব'ললেন—"দূষিত জঘন্য আবহাওয়া কিসে?"

"সে কথা বোঝাতে গেলে আমার ন বৎসরের কাউন্সিলারী জীবনের ট্র্যাজেডি বর্ণনা ক'র্তে হয়।"

"ট্রাজেডি! বলেন কি?"

"গত বৎসর এমনি সময় আমার মেয়ে মরে। মরবার আগের রাত্তিরে—সারারাত বাড়ীশুদ্ধ লোক রোগীর বিছানার পাশে জেগে ব'সে রইলুম, কখন তার শেষ নিঃশ্বাসটি পড়ে তার প্রতীক্ষায়। রাত কেটে গেল, ভোরের দিকে রোগী একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল'। বাড়ীশুদ্ধ লোক শ্রান্ত হ'য়ে যে যেখানে পেলে একটু গড়িয়ে নিলে। কিন্তু হতভাগ্য আমি, একটু চোখ বোজবার সুযোগ পেলুম না। ভোর হ'তে না হ'তে রেট্ পেয়ার্দের দল বাড়ীতে এসে হল্লা সুরু ক'রলে, সেই দিনই তাদের এসেস্মেণ্ট্ কেস্। দুপুর বেলা আমি যখন সেকেণ্ড ডেপুটির সঙ্গে বকাবকি ক'রছিলুম আমার রেট্-পেয়ারদের এসেস্মেণ্ট্ কেস্ নিয়ে, তখন আমার মেয়ে দুবার 'বাবা বাবা' ব'লে ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ফেললে। সে ডাক আমার কানে পৌঁছল' না। মিউনিসিপ্যালটির ঝামেলা মিটিয়ে সন্ধ্যেবেলা দৌড়ে এসে যখন রোগীর ঘরে ঢুকতে গেলুম, দেখলুম ঘর খালি। মা আমার অভিমান ক'রে পালিয়ে গেছে।" কাউন্সিলার্ আর ব'লতে পারলেন না; তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল'। বৃদ্ধ মহানন্দও চোখ মুছলেন।

একটু শান্ত হ'য়ে কাউন্সিলার্ আবার ব'ললেন—"সংক্ষেপে এই হ'চ্ছে কাউন্সিলারী জীবন। তা একে ট্রাজেডিই বলুন আর কমেডিই বলুন।"

খানিকক্ষণ গড়গড়ার নলটা শক্ত ক'রে ধ'রে নিঃশব্দে ধূম উদ্গীরণ ক'রে, বৃদ্ধ মহানন্দ ব'ললেন—"তা হ'লে আপনি কি ব'লতে চান, আমার নাগানন্দ যদি কাউন্সিলার্ হয় তা হ'লে তাকে বাপের মুখাগ্নি ফেলে ছুটতে হ'বে রেট্-পেয়ারদের এসেস্মেণ্ট্ কেস এটেণ্ড ক'রতে?"

"নিশ্চয়; তা না হ'লে, ডেমক্রেসি হ'ল কিসে?"

বৃদ্ধ মহানন্দ কাউন্সিলারের হাত দুটি চেপে ধ'রলেন,—"আমায়

রক্ষা করুন; নগেনের মাথা থেকে ও ভূত নামিয়ে দিন। ঐ আমার এক ছেলে, আমার মুখাগ্নি না হ'লে আমাকে নরকে গিয়ে পচতে হবে। আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

"বিপদ ব'লে বিপদ। এ ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে আর রেহাই পাবার উপায় নেই। ন বৎসর আগে যেদিন প্রথম শুনলুম আমি নির্বাচিত হ'য়েছি, সেদিন আনন্দে আমি সারারাত ঘুমোতে পারলুম না। তার পরের দিন থেকেই আমার ট্র্যাজেডির অভিনয় আরম্ভ হ'ল; এক বৎসর যেতে না যেতে প্রতিজ্ঞা ক'র্লুম আর এ ঝামেলা নয়, একবার রেহাই পেতে পারলে বাঁচি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল', নেশা ততই জমে উঠতে লাগল'। তিন বৎসর পরে আবার পাগলের মত ছুটাছুটি আরম্ভ ক'রতে হ'ল। দেশের হাইকমাণ্ড্দের বাড়ী থেকে পাড়ার গুণ্ডাদের বাড়ী পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ের তলার এক প্রস্থ চামড়া উঠে গেল। তারপর কত ছলনা, কত মিথ্যা অভিনয় ক'রে তবে ইলেক্শনে জিতলুম, ভাবলুম মোক্ষ লাভ হ'ল।"

বৃদ্ধ মহানন্দ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শুনতে লাগলেন।

"ন বৎসর আগে 'বারে' আমার বেশ নাম ছিল; পসারও মন্দ ছিল না; আজ সব গেছে।"

"বলেন কি? তাহ'লে নগেন কাউন্সিলার হ'লে আমার এই বিষয় সম্পত্তি......?"

"সব পঞ্চভূতে লুটে খাবে।"

শুনতে শুনতে বৃদ্ধ মহানন্দের বুকখানা বরফের মত হিম হ'য়ে গেল।

তারপর দুজনে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনা চ'লল কি ক'রে নগানন্দ বাবাজীবনকে এই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

শেষ স্থির হ'ল, কাউন্সিলার্ মহোদয় নগেন বাপধনকে সঙ্গে নিয়ে

কিছুদিন ঘুরবেন এবং কাউন্সিলারী জীবনের এই তিক্ততার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন ; তাহ'লে স্বেচ্ছায় সে আর এই সর্বনাশের পথে আসতে চাইবে না।

আলোচনার শেষে নগেন বাবুকে ডেকে পাঠান হ'ল। তিনি এলে বৃদ্ধ মহানন্দ ব'ললেন—"ইনি স'রে দাঁড়ালেও তোমার আন্‌কনটেস্‌টেড্‌ হবার উপায় নেই। ফলে তোমাকে কেবল একটা পরাজয়ের লজ্জা পেতে হ'বে। তবে ইনি প্রস্তাব করছিলেন—ইনি আমার মতই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—ইনি ব'লছিলেন, কিছুদিন তুমি এনার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জায়গায় ঘুরে লোক-প্রিয়তা অর্জন কর। আজ হয়ত' তোমায় কেউ চেনে না, কিন্তু এনার সঙ্গে সঙ্গে সভাসমিতিতে, রেট্‌পেয়ারদের আসরে আড্ডায় ঘুরলে তিন বছরের মধ্যেই তুমি একজন পাকা পাব্লিক্‌ম্যান্‌ হ'য়ে উঠবে। তখন পাঁচজনেই তোমায় ইলেক্‌শনের জন্যে দাঁড় করাবে ; জয়ও হবে তোমার পক্ষে খুব সহজসাধ্য।"

কাউন্সিলার ব'ললেন—"পলিটিক্স ব'লতে শুধু কাজকে বোঝায় না, কাজ করবার কৌশলকেও বোঝায়। সে কৌশলই তোমার আগে আয়ত্ত করা চাই।"

প্রস্তাব শুনে নগেন বাবু মনে মনে কাউন্সিলারের মুণ্ডপাত ক'রতে লাগলেন। কিন্তু তিনি খুব দূরদর্শী, প্রকাশ্যে কিছুই ব'ললেন না। কাউন্সিলার্‌ তাঁর পিঠ চাপড়ে ব'ললেন—"ভায়ার আমাদের পিতৃভক্তি অননুকরণীয় ; ও কি বাপের মুখের উপর না ব'লতে পারে।"

বৃদ্ধ মহানন্দ খুসী হ'য়ে ব'ললেন—"সে কথা একশ'বার।"

নাগানন্দ বাপের কথায় আপাততঃ অমত ক'রলেন না, কারণ রাজনীতির সদর দরজার চাবিকাটিটি তাঁর হাতে ; কিন্তু কাউন্সিলারের

উদ্দেশ্যে তিনি মনে মনে ব'ললেন,—"তোমার অস্ত্রে আমি তোমাকেই মারব'।"

সেই দিনই বৈকালে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সুরু হ'ল। সেদিন সরস্বতী পূজা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কাউন্সিলার মহোদয়ের নিমন্ত্রণ এসেছে। তিনি নাগানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নিমন্ত্রণ-অভিযান সুরু ক'রলেন।

গাড়ীতে উঠবার আগে কাউন্সিলার ফাইল থেকে বের ক'রে পত্রগুলি নাগানন্দের হাতে দিলেন।

সেগুলি গণনা ক'রে নাগানন্দ ব'ললেন,—"এতে আটচল্লিশখানি পত্র আছে। কোথা কোথা যাবার সিদ্ধান্ত ক'রেছেন?"

"সব জায়গায়ই যেতে হবে।"

নাগানন্দ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কাউন্সিলারের দিকে চেয়ে দেখলেন।

প্রশান্তভাবে কাউন্সিলার জবাব দিলেন,—"কত নদ-নদীর জল দিবারাত্র সাগরে এসে প'ড়ছে; তবুও সাগর কখন দুকূল উপছে পড়ে না। গীতা পড়'নি নাগানন্দ?"

"তা ত' পড়েছি, কিন্তু কোথাও ত' এমন কথা চোখে পড়েনি যে কাউন্সিলারদের ভুঁড়ির পরিমাণ হবে সাগরের মত গভীর।"

এই কথায় কাউন্সিলার মহোদয় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ব'ললেন,—"স্বামীজি ব'লেছেন—'যাঁরা কর্মযোগী, তাঁরা কর্ম করবার কৌশল জানে', তেমনি জেনো, যাঁরা জননায়ক তাঁরাও জনসাধারণকে খুসী রাখবার কৌশল জানে।"

নাগানন্দ কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন।

কাউন্সিলার বলতে লাগলেন,—"এই কৌশল শেখাব' ব'লেই ত' তোমাকে আজ সঙ্গে ক'রে নিলুম। তুমি ধনীর সন্তান, তুমি যদি ব'লতে বিনা নিমন্ত্রণে রবাহুত হ'য়ে কোথাও যাওয়ায় তোমার সম্মানে বাধবে,—তা তুমি অনায়াসেই ব'লতে পারতে,—কেউ তোমায় দোষ দিত না। শুধু আমি বুঝতুম জনসেবা তোমার কর্ম নয়। কিন্তু তা যখন তুমি বলনি, তখনই বোঝা যাচ্ছে, তুমি নিরভিমানী, উজ্জ্বল তোমার ভবিষ্যৎ, অল্পদিনেই তুমি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক ব'লে গণ্য হ'তে পারবে।"

নাগানন্দের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল।

গাড়ীতে দুজনে উঠে, কাউন্সিলার ড্রাইভারকে কোথায় কোথায় যেতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আবার আলোচনা সুরু ক'রলেন ঃ—

"এই যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন আমরা যাচ্ছি, এরাই হ'চ্ছে আমাদের ওয়ার্ডের প্রাণকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলিকে যদি তুমি হস্তগত ক'রতে পার, তা হ'লে তুমিই হবে সারা ওয়ার্ডটির একচ্ছত্র নায়ক। কিন্তু এক সঙ্গে এদের সকলের প্রিয়পাত্র হওয়াই হ'চ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল রাজনীতি। আজ এক সঙ্গে তুমি দেখতে পাবে কত পরস্পর-বিরোধী মতামত, কত পরস্পর-বিরোধী রুচি। তাসের আড্ডায় গিয়ে যদি তুমি বেদান্তদর্শনের কথা তোল, কেউ তোমায় আমল দেবে না; আবার সাহিত্য সভায় গিয়ে যদি তুমি শিল্প-বাণিজ্যের কথা বল, তোমায় বাতুল হ'তে হবে। গীতা-সোসাইটিতে গিয়ে অদ্বৈতবাদ নিয়ে তুমি যেভাবে আলোচনা ক'রবে, তাসের আড্ডায় গিয়ে কন্‌ট্রাক্ট্‌ ব্রীজ্‌ সম্বন্ধে যদি তুমি ততখানিই পারদর্শিতা দেখাতে পার', তা হ'লেই বোঝা যাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

এইভাবে আলোচনা ক'রতে ক'রতে তাঁদের মোটর যেখানে এসে থামল', সেটা হ'চ্ছে একটা পাব্লিক্ লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীর সেক্রেটারী কয়েকজন সভ্যকে নিয়ে সামনেই বসে ছিলেন; তাঁরা সসম্মানে কাউন্সিলার মহোদয়কে সঙ্গী সহ অভ্যর্থনা জানালেন ও সঙ্গে ক'রে প্রতিমার কাছে নিয়ে গেলেন।

মূর্তি দেখে নাগানন্দ কাউন্সিলারকে ব'ললেন,—"এ ত' বুদ্ধ-মূর্তি দেখছি।"

সগর্বে বেশ একটা অধ্যাপকী ঢঙে সেক্রেটারী জবাব দিলেন,—"না, এটি হ'চ্ছে, বাগ্দেবীর প্রাক্-বৈদিক মূর্তি।"

কাউন্সিলার অমনি ব'লে উঠলেন,—"ঠিক! বেদে এই রূপেই দেবীকে কল্পনা করা হ'য়েছে।"

সেক্রেটারী মাথা নেড়ে ব'ললেন,—"না, বেদে নয়, বেদ প্রকাশের পূর্বে দেবী যখন পুত্র কামনায় হিমালয়ে ব'সে ধ্যান ক'রছিলেন, এ তারি পরিকল্পনা।"

নাগানন্দ ব'ললেন,—"হিমালয়ের কঠিন পাষাণের বুকে বেশ বড় বড় পদ্মফুল ফুটত' ত!"

সেক্রেটারী ব'ললেন,—"না, ঐ পদ্মটি ফুলের প্রতীক্ নয়, জ্ঞানের প্রতীক্।"

কাউন্সিলার্ অমনি সায় দিয়ে ব'ললেন,—"ঠিক! রবীন্দ্রনাথ তাই ব'লেছেন, 'আলোর শতদল'..."

সেক্রেটারী ব'ললেন,—"চমৎকার! আপনিই আমাদের পরিকল্পনার যথার্থ মর্ম গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন।"

কাউন্সিলার্ ব'ললেন,—"হিন্দুকৃষ্টির ভিতর আপনাদের এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিচ্ছে।"

বাক্যালাপের গতি এইখানে একটু বন্ধ রেখে, দুটো পুরাণো কথা বলা যাক্। এই লাইব্রেরীটি পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকের আড্ডা। পাড়ার মধ্যে এদের প্রভাব বড় কম নয়। তিন বৎসর পূর্বে ইলেক্‌শনের সময় কাউন্সিলার মহোদয় এঁদের কাছে এক প্রতিশ্রুতি দেন যে, লাইব্রেরীর গাঠাগার নির্মাণের উপযুক্ত জমি বিনামূল্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে আদায় করিয়ে দেবেন। গত নির্বাচনের সময় এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে লাইব্রেরীর সদস্যেরা এই কাউন্সিলারটির জন্যে যে পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি ক'রেছিলেন, তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিন বৎসর কেটে গেছে, আজও কাউন্সিলার্ মহোদয় তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন ক'রতে পারেন নি। অথচ আগামী নির্বাচন আসন্ন।

সেক্রেটারীর পিট চাপড়ে কাউন্সিলার ব'ললেন,—"আপনার 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস'..."

সংশোধন ক'রে সেক্রেটারী ব'ললেন,—"না 'বৈদিক ভারতের কৃষ্টি'..."

"ইয়েস্! বইখানির কেন যে দেশে এত আদর, দেবী-মূর্তির এই অভিনব পরিকল্পনা থেকে তা বেশ বোঝা যায়।"

কাউন্সিলারের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে একটু চাপা গলায় নাগানন্দ ব'ললেন,—"বইখানি কিন্তু বাজারে কাটছে না, পোকায় কাটছে।"

নাগানন্দের এই অবান্তর শ্লেষকে যেন চাপা দেবার জন্যে আর একটু জোর গলায় কাউন্সিলার্ ব'ললেন,—"বেদই ব'লুন আর শাস্ত্রই ব'লুন, ধর্মের আসল উৎস মনে। আপনার মনের মধ্যে যে দেবী-মূর্তি নিয়ত ধ্যানের আসনে ব'সে আছেন, আপনি তাঁকেই এনে হাজির

করেছেন আমাদের চর্মচক্ষুর সামনে। সার্থক আপনার ধ্যান, সার্থক আপনার সাধনা আর সার্থক আপনার শিক্ষা।"

সেক্রেটারী বড় বড় দুটো চোখ বের ক'রে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন; যেন তাঁর চোখ দুটো ব'লতে লাগল',—"ওরে নিন্দুক শোন, এর উপর আর কার কি কথা আছে। যিনি এ কথা ব'ললেন, তিনি যে সে লোক নন্, আমাদের ওয়ার্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক।"

একজন সভ্য এসে সেক্রেটারীর কানে কানে কি ব'লে গেল; সেক্রেটারী সবিনয়ে কাউন্সিলারকে "একবার এদিকে আসতে হবে" ব'লে যেখানে জলযোগের আয়োজন হয়েছে, সেইখানে নিয়ে গেলেন।

নাগানন্দ স্বাস্থ্যের অজুহাতে জলযোগের আসনে ব'সলেন না; সেক্রেটারীও তাঁকে একবার বই দুবার অনুরোধ ক'রলেন না। কাউন্সিলার মনে মনে ব'ললেন, ভালই হ'ল, আমাদের জনপ্রিয়তার তারতম্য ও একটু স্পষ্ট ক'রেই বুঝুক।

নাগানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলার মহোদয়ের খাওয়া দেখলেন, আর ভাবলেন এই পেটুক কাউন্সিলারটিকে আজ একটু শিক্ষা দিতে হবে।

আর একজন সভ্য সেক্রেটারীকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে ব'ললেন,—"এইবার লাইব্রেরীর জমির কথাটা তুলুন না।"

সেক্রেটারী ব'ললেন,—"আগে ইলেক্‌শনটি হ'য়ে যাক্।"

"উনি যদি এবার ইলেক্‌টেড্ না হন?"

"পাগল হয়েছ? ওঁর মত মনীষী ব্যক্তি আর আছে? উনি যদি ইলেক্‌টেড্ না হন, তাহ'লে ত' মিউনিসিপ্যালিটি উঠে যাবে; জমি আর দেবে কে? নিমন্ত্রণ ক'রে এনে, এখন ওনাকে বিরক্ত ক'রো না।"

বিদায় নেবার সময় সকলের সঙ্গে নাগানন্দের পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাউন্সিলার গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ীতে উঠে নাগানন্দকে লাইব্রেরীর নিমন্ত্রণ পত্রের পিছনে কি সব লিখতে দেখা গেল।

"কি লিখছ হে?" কাউন্সিলার প্রশ্ন ক'রলেন।

"আপনি এখানে যা যা খেলেন, তারি একটা তালিকা ক'রছি।"

"কেন?"

"আটচল্লিশ জায়গার তালিকা একত্র ক'রে দেখব', তিন বৎসর পরে আমাকে যদি ইলেকৃশনে নামতে হয়, তা হ'লে ইতিমধ্যে আমার পাকস্থলীর পরিমাপ কতখানি বাড়াতে হবে।"

কাউন্সিলার মহোদয় আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি থামতে না থামতে গাড়ী এসে একটা ক্লাবের সামনে থামল'।

এখানেও প্রাথমিক আদর-আপ্যায়নের পর দুজনে এসে দেবীর সামনে দাঁড়ালেন।

এখানে আর দেবীমূর্তি সমাধিস্থ নন্, নৃত্য-চঞ্চল। দেবী একটি পা জল-ক্রীড়ারত হাঁসের পিঠে রেখে উদয়শঙ্করী ঢঙে এক বিচিত্র নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

মূর্তি দেখে নাগানন্দ ব'ললেন,—"এ মূর্তি দেখে আর বেদ-বেদান্ত নয়, মনে হয় আমাদের ইউনিভার্সিটি এবার ড্যান্‌সিংকে কম্‌পাল্‌সারী সাবজেক্ট্ ক'রবে। কিন্তু হাঁসের গলাটা যে অমন টানা লেবেঞ্চুসের মত লম্বা হ'ল কেন, তা ত' বোঝা গেল না।"

এই সব কথায় ক্লাবের সদস্যগণ রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। কাউন্সিলার সেভাবটা বুঝতে পারলেন, ব'ললেন,—"নাগানন্দ, সকল বিষয়েই হাস্যরসের অবতারণা করবার তোমার যেমন আশ্চর্য দক্ষতা

আছে ; বেদ-বেদান্তের নীরস অধ্যায়গুলির মধ্যেও আর্টকে বিচিত্র কৌশলে ফুটিয়ে তোলবার মত অপূর্ব সৃজনীশক্তি এই ক্লাবের সদস্যদের আছে। আমি বরাবরই এটা লক্ষ্য ক'রে আসছি।"

কাউন্সিলারের কথায় সকলের মুখে মেঘ কেটে গিয়ে রোদের আলো দেখা দিল। একজন সদস্য আগিয়ে এসে ব'ললেন,—"এ মূর্তির মধ্যে শুধু আর্ট নেই সার, দর্শনও আছে, বেদান্তও আছে।"

নাগানন্দ কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কাউন্সিলার ব'ললেন,—"ইয়েস্! আমি লক্ষ্য করেছি।"

সদস্যটি উৎসাহ পেয়ে ব'ললেন,—"ঐ দেখুন, দেবীর পাদস্পর্শে হংসরাজ পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়তে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল, এখনও দেবীর অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাই দেবীর অনুমতির অপেক্ষায় যেমন সে মুখ তুলে চাইলে, অমনি শুনতে পেলে দেবীর কণ্ঠে রাগরাগিণীর মোহিনী ঝঙ্কার। সেই ঝঙ্কারে হংসরাজের কণ্ঠ তরঙ্গায়িত হ'ল ; দীর্ঘকণ্ঠে দেবীর ক্ষীণ কটীদেশ বেষ্টন ক'রে মুখখানি নিয়ে গেল দেবীর মুখের সামনে, কণ্ঠভরে সেই সঙ্গীত-সুধারস পান ক'রবে ব'লে।"

কাউন্সিলার্ মহোদয় ব'লে উঠলেন,—"সাধু, সাধু, কালিদাসের কালে না জন্মেও আমরা শুনতে পেলুম আকাশের বুক দিয়ে নেমে এল', স্বর্গীয় সেই বীণা-ধ্বনি।"

একজন সদস্য ব'ললেন,—"মরি, মরি।"

আর একজন ব'ললেন,—"একজন যথার্থ গুণীকে পেয়ে আমাদের পরিকল্পনা আজ মূর্তিমন্ত হয়ে উঠল'।"

এর পরের ঘটনাটুকু নিছক গদ্য। কাউন্সিলার মহোদয়ের বিশেষ প্রবৃত্তি না থাকলেও "যৎকিঞ্চিতে"র হাত এড়াতে পারলেন না।

বলাবাহুল্য যে নাগানন্দকে এর জন্য বিশেষ কেউ পীড়াপীড়ি ক'রলেন না। এবারেও তাঁর কৌশল ফলপ্রসূ হল।

গাড়ীতে উঠে এই যৎকিঞ্চিতের তালিকা ক'রে নাগানন্দ ব'ললেন, —"এখানেও মন্দ হ'ল না সার্।"

সার্ ব'ললেন,—"বড্ড যে সব আমায় ভালবাসে।"

এর পরে একটি বালিকা বিদ্যালয়।

এখানেও মা আমাদের প্রাচ্য আর্টের নিগড়ে একটি ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে বসে আছেন, সেতারখানি নিয়ে, ঘাড়টি বেঁকিয়ে, একটি হাঁটু মুড়ে যেন তিনি অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কম্পিটিশনে সেতারের সোণার মেডেলখানি পাবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেছেন। ক্লাশিক্যাল্ ছন্দের লয়ে লয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর খোঁপা গেছে খুলে, চুল পড়েছে এলিয়ে। নাগানন্দ এসব হয়ত' বরদাস্ত ক'রতেন, কিন্তু আর্টের কল্যাণে মায়ের যে সব চুলগুলি পেকে সাদা হ'য়ে গেছে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারলেন না, কাউন্সিলারের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন,—"দেখুন, আদ্দিকালের এই বদ্দিবুড়ীকে নিয়ে গ্রাম্য প্রদর্শনীর ওপনিং সং বেশ চালিয়ে নেওয়া যায়; কিন্তু তাঁকে নিয়ে সরস্বতী পূজা চলে না।"

কাউন্সিলার্ হেসে ব'ললেন—"তোমার সমস্ত হাস্যরসের মধ্যে বেশ একটা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আমি বরাবরই ফুটে উঠতে দেখি।"

এদের অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন, একজন প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী। রংটা তাঁর মিশকালো এবং এখনও তিনি মিস্ই আছেন কারণ চেহারার জন্যে তাঁর বিয়ে হয় নি। রংটা তাঁর যাই হ'ক, বেশভূষায় কিন্তু পারিপাট্যের অভাব নেই। প্রাচীন বয়সেও এই বালিকাসুলভ বেশ-

ভূষার মধ্য দিয়ে তিনি নিয়ত দর্শকদের চোখে প্রচুর হাস্যরসের খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষয়িত্রী একটু আগিয়ে এসে একটা অস্বাভাবিক নাকীস্বরে ব'ললেন,—"উনি ঠিকই ব'লেছেন, গ্রাম্য প্রদর্শনীর মূলবাণী এখানে ফুটে উঠেছে—'ব্যাক্ টু ভিলেজ্'—গ্রামে ফিরে যাও।"

কাউন্সিলার্ সোৎসাহে ব'লে উঠলেন—"ঠিক! আমিও সেই কথা ব'লছি, মা আমার পল্লীবধূরূপে নেমে এসেছেন পল্লীর কুটিরে, কুটির-শিল্পের মধ্যে দিয়ে বাঙলার দৈন্য চিরতরে দূর ক'রে দিতে।"

নাগানন্দ ব'ললেন,—"এই জন্যই কি মায়ের এই দুর্ভিক্ষের বেশ, বিধবার সাদাধুতি?"

কাউন্সিলার্ ব'ললেন,—"না নাগানন্দ, মা আমাদের সকল বর্ণের অতীত শ্বেতাম্বরভূষিতা।"

কাউন্সিলারের মুখে এই চমৎকার ব্যাখ্যা শুনে শিক্ষয়িত্রী উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন,—"রঙের মধ্যে দিয়ে কি মায়েব রূপকে পাওয়া যায়?"

নাগানন্দ আর কোন কথা ব'ললেন না, শুধু একবার বক্রদৃষ্টিতে বক্তার রামধনু-রঙের সাড়ীখানির দিকে চেয়ে দেখলেন।

কাউন্সিলার্ এই সুযোগে তাঁর অসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ ক'রলেন,—"আমি যতই দেখছি, আপনাদের মহৎ আদর্শে আমার মন ততই ভ'রে উঠছে। আপনাদের হাতে দেশের মেয়েদের শিক্ষার ভার যখন প'ড়েছে, তখন মুক্তি আর কতদূর!"

ইত্যাদি মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট ক'রে কাউন্সিলার্ সঙ্গীসহ মুক্তি' চাইলেন। কিন্তু মুক্তি কি অত সহজ? আবার তাঁকে জলযোগের আসনে 'একবার ব'সতে হ'ল'। এই গোলযোগ এড়াতে এবার

কিন্তু নাগানন্দের কটু সমালোচনার কৌশল কাজে এল' না। বরং তাঁর দিব্য সুঠাম চেহারা প্রাচীনা শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ মনোযোগের কারণ হ'য়ে দাঁড়াল'। যখন কিছুতেই এড়ান' যায় না, তখন নাগানন্দকে নূতন কৌশল অবলম্বন ক'রতে হ'ল। তিনি ব'ললেন —"দেখুন, আমার বাবার ডায়েবিটিস্ আছে; তিনি তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তিটাও উইল ক'রে আমার নামে লিখে দিয়ে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই আমি 'প্রিভেন্‌সন্ ইজ্ বেটার্ দ্যান্ কিওর্' এই সূত্র অনুসরণ ক'রে যাচ্ছি।" বিরাট্ একটা হাসির রোল উঠল', আর সেই ফাঁকে নাগানন্দ একেবারে মোটরে উঠে ব'সে হাঁফ ছাড়লেন।

নাগানন্দকে হাতছাড়া হ'তে দেখে, প্রাচীনা শিক্ষয়িত্রী প্রাচীন কাউন্সিলারটিকেই নিয়ে প'ড়লেন। যত্নের ঠেলায় কাউন্সিলারের প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠল'। অতি কষ্টে রেহাই পেয়ে তিনি যখন গাড়ীতে এসে ব'সলেন, তখন নাগানন্দ মৃদু মৃদু হাসছে। হাসি দেখে কাউন্সিলার্ জ্বলে উঠলেন, ব'ললেন,—"তুমি ত' পালিয়ে বাঁচলে, তার শাস্তিস্বরূপ আমাকে দুজনের খাবার খেতে হ'ল।"

নাগানন্দ হেসে ব'ললেন,—"বেশ ত', আপনার পপুলারিটি দ্বিগুণ হ'য়ে গেল।"

কাউন্সিলার্ খুসী হ'য়ে ব'ললেন,—"জান, নাগানন্দ, গত ইলেক্-শনের সময় এই শিক্ষয়িত্রীটি স্কুলের মেয়েদের নিয়ে যে স্বেচ্ছা-সেবিকাবাহিনী গঠন করেছিলেন আমার বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভের জন্য তারাই ছিল সব চেয়ে বেশী দায়ী। এদের সব রকম অত্যাচারই আমাকে সহ্য ক'রতে হবে। এদের বার্ষিক গ্রাণ্ট্ ইন্ এইড্ বাড়াবার জন্যে আমি খুব চেষ্টা করেছিলুম, সফলও হতুম; কিন্তু হঠাৎ মাঝ

থেকে এই শিক্ষয়িত্রীটি বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা ক'রেই সব মাটি ক'রে দিলেন।"

নাগানন্দ ব'ললেন,—"আমি বড় কর্তা হলে, গ্রাণ্ট্ ইন্ এইড্ একেবারে বন্ধই ক'রে দিতুম।"

কাউন্সিলার্ ব'ললেন,—"চুপ চুপ কেউ শুনতে পাবে ; গণদেবতাকে খুসী রাখাই আমাদের কাজ।"

নাগানন্দ ব'ললেন,—"আচ্ছা বেশ, গণদেবতাকে খুসী রাখতে উদর-দেবতার কি ভোগ দিলেন, বলুন, তালিকাটি সম্পূর্ণ করি।"

কাউন্সিলার্ মহোদয়ের তালিকার অভিনবত্বের জন্য বেশ একটু কৌতূহল ছিল, তাই তিনি যা যা এখানে খেয়েছেন গড়গড় ক'রে ব'লে ফেললেন ; কিন্তু নাগানন্দের লেখা শেষ হবার আগেই মোটর চতুর্থ স্থানে এসে থামল'। তালিকা সম্পূর্ণ করবার অজুহাতে নাগানন্দ এখানে আর নামলেন না। কাউন্সিলার্ একাই নেমে গেলেন।

এটি একটি বালক-বিদ্যালয়, ছোট্ট একটি মাইনর স্কুল।

স্কুলের হেড্ মাষ্টার প্রাচীন-পন্থী। আধুনিকতা তাঁর দুচক্ষের বিষ। বিশেষ ক'রে ঠাকুর-দেবতার মধ্যে আর্টের বালাই দেখলে তিনি একেবারে জ্বলে ওঠেন। তাই অনেক যত্নে অনেক খুঁজে তিনি প্রাচীন ধরণের এই মূর্তিটি কিনে আনিয়েছেন। নিজের হাতে এঁকে পূজা ক'রেছেন শাস্ত্রসম্মত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটী বজায় রেখে।

হেড্ মাষ্টারের সঙ্গে দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলার্ অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, তারপর ব'ললেন,—"আঃ এতক্ষণে যথার্থ শান্তি পেলুম। ধূপধূনার গন্ধে মন পবিত্র হ'য়ে গেল।...আর মশায়! দেশে কি আর ধর্ম আছে! আর্ট-আর্ট ক'রে ত' সব গোল্লায় যেতে বসেছে। 'কোথাও দেখি মা আমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, কোথাও দেখি তিনি

হাঁসের পিঠে দাঁড়িয়েই নাচতে আরম্ভ করেছেন, কোথাও তিনি মিউজিক্ কম্পিটিশনের জন্য উঠেপ'ড়ে লেগে গেছেন। কালে কালে সব কি যে হচ্ছে? এ যুগেও যে আপনার মত ব্রাহ্মণ দু একজন আছেন, একি আমাদের কম আশার কথা!"

এই প্রশংসায় হেড্ মাষ্টারের চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল'। এমন ক'রে তাঁর মনের বেদনা আর ত' কেউ ইতিপূর্বে ধরতে পারেনি; এমন ক'রে আর ত' কেউ তাঁর মনের কথাটি প্রকাশ ক'রে বলতে পারেনি।

হেড্ মাষ্টার প্রাণখুলে তাঁদের ওয়ার্ডের এই প্রধান নাগরিকটিকে প্রশংসার ছলে আশীর্বাদ ক'রতে লাগলেন; আর আগামী নির্বাচনে তাঁর সাফল্য যে সমগ্র হিন্দুজাতির সাফল্য তা পুনঃ পুনঃ ব'লতে লাগলেন।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে যখন কাউন্সিলার মহোদয় উঠি উঠি ক'রছেন তখন একটি ছোট্ট ছেলে একটি ছোট মাটির থালায় কয়েকটি মিষ্টি ও ফল সাজিয়ে এনে সামনে রাখলে।

তিনি হেড্ মাষ্টারের দিকে চেয়ে জোড়হাত ক'রে ব'ললেন,—"এবারের মত মাপ ক'রতে হবে। কয়েক জায়গায় খেয়ে এসেছি; আর খেলে অসুখ ক'রবে।"

হেড্ মাষ্টার মাথা নেড়ে ব'ললেন,—"যা খেয়েছেন, তা হচ্ছে রাজভোগ, অসুখের ভয় তাতেই ছিল। কিন্তু এ আমার মায়ের যৎ-সামান্য প্রসাদ, এতে ত' অসুখ করেনা।"

মায়ের প্রসাদ! এর উপর আর আপত্তি করা চলে না; ক'রলে হিন্দুয়ানী সম্বন্ধে এইমাত্র তিনি যে সার্টিফিকেট্ পেয়েছেন, তা ভেস্তে যায়। নির্বাচন আসন্ন; কাজেই কাউন্সিলার্ মহোদয়কে মায়ের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি প্রণাম ক'রে প্রসাদগুলি সব গ্রহণ ক'রতে হ'ল।

গাড়ীতে উঠে দেখেন নাগানন্দ একেবারে কলম রেডি ক'রে বসে

আছেন ; তিনি একটু হেসে ব'ললেন,—"লিখে যাও।" নাগানন্দ লিখে গেলেন, শেষে ব'ললেন,—"এবারেও মন্দ হ'ল না সার !"

এইভাবে নানা ছলনায় সকলের মনোরঞ্জন ক'রে, আগামী নির্বাচনে আপনার সাফল্যের একটা পাকা বনিয়াদ গ'ড়ে, সমস্ত নিমন্ত্রণগুলি একে একে শেষ ক'রে, কাউন্সিলার্ মহোদয় অধিক রাত্রে যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন তিনি ড্রাইভারকে গাড়ী খুব আস্তে চালাতে ব'ললেন।

নাগানন্দ জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"আস্তে কেন ?"

অতি কষ্টে কাউন্সিলার্ নিজের গলা পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলেন,—"একেবারে এতখানি এসে গেছে, একটু ঝাঁকুনি লাগলেই বমি হ'য়ে যাবে।"

মৃদু একটুখানি হেসে নাগানন্দ আবার নিজের কাজে মন দিলেন। কাউন্সিলার্ মহোদয় এতগুলি স্থানে কোথায় কি খেয়েছেন নাগানন্দ তখন তার সম্পূর্ণ তালিকার যোগফল নির্ণয়ে ব্যস্ত। মন্থর গতিতে গাড়ী চলায় তাঁর কাজের সুবিধাই হ'ল।

কাউন্সিলারের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে যখন থামল' তখন তিনি নাগানন্দের হাত ধ'রে অতি কষ্টে নামলেন। কাউন্সিলার্ নাগানন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ঐ গাড়ীতেই বাড়ী ফিরবার উপদেশ দিয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, নাগানন্দ ব'ললেন,— "একটু দাঁড়ান পায়ের ধূলো নিয়ে যাই।"

কাউন্সিলার্ ব'ললেন,—"সে আবার কি ?"

নাগানন্দ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে কাউন্সিলারের পায়ের ধূলো নিলেন ; নিয়ে ব'ললেন,—"আপনি মহাপুরুষ, আপনি যথার্থই কর্মযোগী, আপনি আজ অসাধ্যসাধন ক'রেছেন ; এই দেখুন আপনি

আজ যা খেয়েছেন তার সম্পূর্ণ যোগফল। বলুন ত' অতি-মানব না হ'লে এ কখন সম্ভব হ'ত?"

নাগানন্দের হাতে যে কাগজখানিতে যোগফল লেখা ছিল সেটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে কাউন্সিলার্ মহোদয় একটা বিকট্ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কপালে উঠল', দাঁতে দাঁত লেগে গেল, এবং নাগানন্দ তাঁকে জড়িয়ে ধ'রতে না ধ'রতে তাঁরই বুকের উপর কাউন্সিলার্ সংজ্ঞা হারালেন।

চীৎকার শুনে বাড়ীর যে যেখানে ছিল ছুটে এল'; কাউন্সিলার্ গিন্নীও নেমে এলেন। কেউ হাঁকলে বরফ, কেউ হাঁকলে জল, আবার কেউবা ডাক্তার, ডাক্তারকে ডেকে আন, ব'লে চেঁচাতে লাগল'। বাড়ীতে এক বুড়ী পিসিমা ছিলেন, তিনি ত' চীৎকার ক'রে মরা কান্না জুড়ে দিলেন। নিষ্পন্দচিত্তে নাগানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, তাঁর হাস্যরস যে এমন করুণ রসে পরিণত হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল কাউন্সিলারকে একটু শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু তার ফল বুঝি একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে মারাত্মকই হ'য়ে দাঁড়ায়!

কাঁদতে কাঁদতে পিসিমা নাগানন্দকে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কি ক'রে এমন হ'ল বাবা?"

নাগানন্দ আদ্যোপান্ত এই নিমন্ত্রণ-কাহিনী ব'লে গেলেন।

শুনে ত' সকলে অবাক্ হ'য়ে গেল।

পিসিমা ব'ললেন,—"বল কি বাবা? একটা মানুষ আটচল্লিশ জায়গায় পর পর নেমন্তন্ন খেয়ে এল!"

নাগানন্দ ব'ললেন,—"কি ক'রবে বলুন! যেখানেই বলেন

খেতে পারব না, তারাই বলে, আমাদের অগ্রাহ্য ক'রছেন, আচ্ছা ভোট্ দেব' না ; কাজেই খেতে হয়।"

কয়েকদিন দুশ্চিন্তাকর অসুস্থতার মধ্যে কাটিয়ে আজ ভোরের দিকে কাউন্সিলার্ একটু স্বস্তিবোধ ক'রতে লাগলেন।

পিসিমা এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কেমন আছ বাবা ?"

উদাসীনভাবে কাউন্সিলার্ জবাব দিলেন,—"আর পিসিমা, ঐ ভোট্ ভোট্ ক'রেই কোন্ দিন বেঘোরে আমার প্রাণটা যাবে।"

পিসিমা কাঁদকাঁদভাবে ব'ললেন,—"কেন ও'সব ক'রতে যাও বাছা ?"

"পিসিমা, আফিম খেলে লোক মরে একথা তুমি জান ?"

"জানি।"

"তবে তুমি আফিম ছাড়তে পার না কেন ?"

"অভ্যেসটা খারাপ ক'রে ফেলেছি যে বাবা।"

"পিসিমা, আমাদের কাউন্সিলারী তোমার আফিমের নেশার চেয়েও পাজি, একবার ধ'রলে আর ছাড়া যায় না।"

হেড্ মাষ্টার

বাঘনাপাড়া এইচ্ ই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা হ'য়ে গেছে। রচনার বিষয় বস্তু ছিল "আদর্শ ছাত্র।" রচনাগুলি পরীক্ষা করবার ভার প'ড়েছিল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মশায়ের উপর।

পরীক্ষা অন্তে পণ্ডিত মশায় একখানি রচনা এনে হেড্ মাষ্টারের হাতে দিয়ে ব'ললেন,—"দেখুন মশায়, এই সব একরত্তি একরত্তি ছেলেগুলোর কত বিদ্যে হ'য়েছে, দেখুন।"

হেড্ মাষ্টার খাতার উপরের নামটী পড়ে ব'ললেন,—"তাত' হ'বেই; আমিত' বরাবারই বলি কিশোর আমাদের মুখ রাখবে।"

পণ্ডিত মশায় একটুখানি বক্রহাসি হেসে ব'ললেন,—"মুখ রাখবে কি পোড়াবে সেই হ'য়েছে কথা; কিশোরের এই লেখাটীত আমাকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছে।"

"তা হ'লে ত' ঐ একরত্তি ছেলে রীতিমত চিন্তাশীল লেখক হ'য়ে উঠেছে ব'লুন?" ব'লেই হো হো ক'রে হেসে উঠে হেড্ মাষ্টার নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

হাসির একটা দমকা হাওয়ায় পণ্ডিত মশায়ের অমূলক আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে হেড্ মাষ্টার নিজের ঘরে এসে কিশোরের রচনাটী পড়তে ব'সলেন। পড়তে পড়তে কতবার তাঁর খটকা লাগল', কিশোর লিখেছে এই সব কথা! কতবার তিনি খাতার মলাটের উপর রচয়িতার নিজের হাতে লেখা নামটী পড়লেন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে। পড়া শেষ হ'য়ে গেলে তিনি গুম হ'য়ে নিজের চেয়ারে ব'সে রইলেন।

বাড়ী এসে সন্ধ্যের সময় তিনি আবার একবার সেই লেখাটী পড়বার চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু আর পড়তে প্রবৃত্তি হ'ল না। সেদিন সারারাত তিনি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ ক'রে কাটালেন; কি যেন একটা অশান্তি তাঁকে শান্ত হ'য়ে ঘুমোতে দিল না।

পরের দিন স্কুলে এসে তিনি সকল শিক্ষককে ডেকে ডেকে কিশোরের রচনাটী পড়িয়ে শোনালেন; সকলেই একবাক্যে ব'ললেন,—"হাঁ, এই জেঠা ছেলেটীকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

"এ ত' শুধু জেঠামি নয়, এ যে বিদ্রোহ; আমার শাসন, আমার শিক্ষা, আমার এতদিনের প্রাণ দিয়ে গড়া এই স্কুলের শৃঙ্খলা, এ যে এই সব কিছুর বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘোষণা, পণ্ডিত মশাই!"

রাগে ক্ষোভে হেড্ মাষ্টারের মুখ দিয়ে কান্নার মত করুণ একটা স্বর বের হ'য়ে এল'।

শিক্ষক মশায়েরা সমস্বরে ব'ললেন,—"ডেকে দিন ঘা কতক কসিয়ে, ঘাড় থেকে ঐ বিদ্রোহের ভূত এখনিই নেমে যাবে।"

ভূতে পাওয়া এই ছেলেটী ছোট্ট একটী রচনার মধ্যে চিন্তার যে

স্বাধীনতা দেখিয়েছে ; গতানুগতিক মামুলী ভাবধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে নিজের স্বতন্ত্র মতামতকে খাড়া ক'রতে যুক্তির যে অবতারণা ক'রেছে ; আর দেশী ও বিদেশী ইতিহাসের পাতা থেকে যে সমস্ত নজির সে আহরণ ক'রেছে, তা একজন পনেরো বছরের ছেলের পক্ষে সত্যিই খুব বাহাদুরীর কথা। কিন্তু কিশোরকে এর জন্যে কেউ বাহাদুরী দিলে না ; শিক্ষক মশায়দের মধ্যে কেউ একটী কথায়ও তার রচনার প্রশংসা ক'রলেন না।

মনের সহজাত আনন্দের সঙ্গে প্রবন্ধ রচনা করবার সময় বিদ্রোহের ভাব একটুও কিশোরের মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু আজ যখন বিচারার্থ হেড্ মাষ্টারের ঘরে কিশোরের ডাক পড়ল', তখন তার অন্তরের সুপ্ত বিদ্রোহী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল'।

প্রথমে হেড্ পণ্ডিত মশায় কথা ব'ললেন,—"কিশোর, তোমার রচনা আমরা সবাই প'ড়েছি। তোমার বয়স অল্প, বুদ্ধি আরও অল্প, সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তোমার নেই। তুমি যে সব কথা তোমার রচনার মধ্যে লিখেছ, আমরা সকলে মনে করি, এ কাঁচা বয়সে সে সব কথা মনে মনে আলোচনা করা তোমার পক্ষে মহাপাপ।"

খুব সহজভাবে কিশোর জবাব দিলে,—"আমি ইতিহাসের পাতা থেকে দেখিয়ে দিয়েছি···"

হেড্ মাষ্টার কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কি দেখিয়ে দিয়েছ?"

হেড্ মাষ্টারের এই স্বর ও এই মূর্তি বিদ্যালয়ের সকলের কাছেই পরিচিত। বিদ্যালয়ের কারোরই সাহস নেই, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমানে জবাব দেয়। হয়ত' কিশোরেরও এ সাহস কোনদিন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আজ তার মনের মধ্যে কি এক ভাব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; কিছুতেই যেন আজ আর তার ভয় করবার নেই।

কিশোর তাই নির্ভীকভাবেই জবাব দিলে,—"আমি দেখিয়ে দিয়েছি, ভয়ই হ'চ্ছে মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় পাপ। পদে পদে গুরুজনদের ভয় ক'রে চললেই, তাঁদের প্রতি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের প্রতি খাঁটি কর্তব্য পালন করা হয় না।"

অঙ্কের মাষ্টার ব'ললেন,—"ইতিহাস সম্বন্ধে ত' তাহ'লে তোমার খুব টনটনে জ্ঞান হ'য়েছে দেখছি।"

"যথার্থ জ্ঞান শুধু তাকেই বলে সার, যার মূলে থাকে সত্য।"

কিশোরের কথা বলার এই মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গী দেখে শিক্ষক মশায়েরা সকলেই চমকে উঠলেন।

পণ্ডিত মশায় ব'ললেন,—"তোমাকে আমরা এখানে ডেকেছি কিশোর, উপদেশ দিতে, তোমার মুখে উপদেশ শুনতে নয়।"

কিশোর বললে,—"পণ্ডিত মশায়, সত্য কি, সে বোঝবার অধিকার শুধু বৃদ্ধদেরই একচেটিয়া নয়, বালক ও যুবকদেরও সে অধিকার আছে। আর সে অধিকার বুঝে নেওয়াকে উপদেশ দেওয়া বলে না।"

"দে, দে বাবা, দে, আমার কানটা মুলে দে।" মাথা হেঁট ক'রে হেড্ মাষ্টার কিশোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে "দে, দে, দে" ব'লে মাথা নাড়তে লাগলেন।

কিশোর কিন্তু একটুও লজ্জিত হ'ল না, তার চোখের কোলে এক ফোঁটাও জল দেখা গেল না। বরং সে দুপা পেছিয়ে গিয়ে এমনভাবে ভ্রুকুটি ক'রলে যেন হেড্ মাষ্টারের এই অর্থপূর্ণ তিরস্কারকে সে অভিনয় মাত্র মনে ক'রে উড়িয়ে দিতে চায়।

কিশোরের রকম দেখে হেড্ মাষ্টার মনে মনে চঞ্চল ও ভীত হ'য়ে উঠলেন। এই ছেলেটা কি ক'রতে চায়? এতদিন ধ'রে যে সুনামের সঙ্গে তিনি স্কুল শাসন ক'রে এসেছেন, যাঁর একটা হুঙ্কারে শিক্ষক ছাত্র

সকলেই ভয়ে কেঁচো হ'য়ে যায়। আজ একরত্তি এই ছেলে কিশোর, তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছাত্র কিশোর, তাঁর এতদিনের সঞ্চিত সুনামের বিরুদ্ধে একি উপহাস আরম্ভ ক'রেছে! সেকি বুঝতে পারছে না, আর সব শিক্ষকদের সামনে তাঁর উঁচু মাথা কতখানি হেঁট হ'য়ে প'ড়ছে। না না এ কখনও তিনি হতে দেবেন না। সকল শিক্ষকের সামনে আজ তিনি প্রমাণ ক'রবেনই যে, কোন ছাত্রের কোন গোঁয়ারতুমি, কোন কালেই, তাঁর শাসনের কাছে পরাজয় স্বীকার না ক'রে পারে না। কিশোরের চোখ দুটো দেখে হেড্ মাষ্টার আরও মরিয়া হয়ে উঠলেন; তিনি বুঝলেন, সত্যিই কিশোরের মাথায় আজ ভূত চেপেছে, ভাল মুখে হবে না।

হেড্ মাষ্টার আস্তে আস্তে ঘরের-কোণে-বসান একটা আলমারী খুলে একটী সরু লিকলিকে বেত বের ক'রলেন। অনেকদিন এর কোন ব্যবহার করা হয়নি, তাই সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে তার তীক্ষ্ণতা একবার পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

বেতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে হেড্ মাষ্টার কিশোরের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব'ললেন,—"এইবার সার সুরেন্দ্রনাথ, তোমার বক্তিমে সুরু কর।"

যেন একটুখানি হেসেই, কিশোর বললে,—"সার সুরেন্দ্রনাথের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে আমি ব'লছি, আমিও তাঁর মত বেত দেখে কখন ভয় পাব' না, যে কথা সত্য ব'লে জানব, তা সহজভাবেই ব'লে যাব'।"

বিদ্যুৎ চমকের মত হেড্ মাষ্টারের হাতের বেত সপাৎ ক'রে কিশোরের উরুতে আঘাত ক'রল'। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে কিশোর সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রল', মুখের উপর একটিও কাতর রেখা ফুটতে দিল না।

সঙ্গে সঙ্গে হেড্ মাষ্টার গর্জন ক'রে উঠলেন,—"বল্না,' বল্, যা লিখেছিস ঐ পাপমুখে আর একবার উচ্চারণ কর, দেখি তোর কতখানি স্পর্ধা হ'য়েছে।"

কিশোর ব'লে যেতে লাগল',—"আমি লিখেছি, বাপমা ও শিক্ষকদের একান্ত অনুগত ও বাধ্য হ'য়ে থাকাই ছাত্র জীবনের প্রধান আদর্শ নয়।"

দৃঢ় মুষ্টিতে বেতগাছি চেপে ধ'রে কিশোরের শরীরে এলোমেলো ভাবে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে, দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে হেড্ মাষ্টার ব'ললেন,—"হুঁ, তারপর?"

যন্ত্রণায় কিশোরের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল', তবুও সে অকম্পিত স্বরে ব'লে যেতে লাগল',—"তারপর আমি ইতিহাসের পাতা থেকে দেখিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের দেশের বিজয় সিংহ থেকে বিলাতের ক্লাইভ্ পর্যন্ত, পৃথিবীর ইতিহাস যাঁরা নানাদিক দিয়ে গ'ড়ে গেছেন, তাঁরা কেউ বাপমা ও গুরুজনদের আদেশ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে যেতে পারেন নি।"

কথা শেষ হ'তে না হ'তে হেড্ মাষ্টারের হাতের উদ্যত বেতখানি আবার নির্দয়ভাবে কিশোরের পিঠের উপর কয়েকবার এসে পড়ল'। মনে হ'ল কিশোরের মত হেড্ মাষ্টারও তাঁর সহজ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। রাগে থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে হেড্ মাষ্টার চিৎকার ক'রে উঠলেন,—"হুঁ, তারপর? তারপর?"

কিশোরের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল' গলার স্বর আর্ত হ'য়ে পড়ল', তবুও সে ভীত হ'লনা, একটা অদম্য চেষ্টায় সে বলে উঠল'—"তারপর আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ ক'রেছি যে, সকল কালে সকল দেশে যে সব মহাপুরুষ জন্মে গেছেন তাঁরা সকলেই স্নেহ ও শাসনের বন্ধন নির্দয়ভাবে

ছিন্ন ক'রতে পেরেছিলেন ব'লেই নিজের জীবন সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিকে বড় ক'রে গেছেন।"

আবার কয়েক ঘা ও সঙ্গে সঙ্গে হেড্ মাষ্টারের চিৎকার,—"হুঁ, তারপর, তারপর ?"

কিশোর উন্মাদের মত চিৎকার ক'রে উঠল',—"তারপর আমি এই ব'লে উপসংহার ক'রেছি যে ভয় ও শাসনের মাথায় এমনি ক'রে পদাঘাত ক'রতে না পারলে……"

হেড্ পণ্ডিত মশায় আর থাকতে না পেরে ছুটে এসে কিশোরকে টেনে নিয়ে ব'ললেন,—"কি পাগলামী হ'চ্ছে, কিশোর ?"

কিশোর উন্মাদের মত ব'লে উঠল',—"আমি পাগলামী ক'রছি, না প্রহ্লাদের মত একটা আসুরিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাচ্ছি ?"

হাতের বেতগাছি ছুড়ে ফেলে দিয়ে, হেড্মাষ্টার নিজে টেবিলের কাছে ছুটে গেলেন। কম্পিতহস্তে রেজিষ্টারী খাতাখানি খুলে কিশোরের নামের উপর দিয়ে লালকালীর কয়েকটি আঁচড় কেটে দিলেন। তারপর সেই স্থানটিতে আঙ্গুল নির্দেশ ক'রে তিনি সকল শিক্ষককে আপনার বিধান জানিয়ে দিলেন।

কিশোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগল', আর ভাবতে লাগল', অতঃপর কি করা উচিত। অবশ্য উচিত অনুচিতের জ্ঞান তার তখন বেশী ছিল না, মারের চোটে তার মাথার ভিতর দিয়ে একটা ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। তবুও সে অনেকটা সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লতে পারলে, "আমার নাম কেটে দিলেন সার ?"

হেড্মাষ্টার মুখখানি বিকৃত ক'রে ব'লে উঠলেন,—"হাঁ বাবা প্রহ্লাদ, এইবার এই অসুরের মায়া কাটাও।"

কিশোর নির্ভয়ে বললে,—"আমাকে জোর ক'রে তাড়িয়ে না দিলে, আমি এখান থেকে একপাও নড়ব' না।"

"তাও কি পারিনা ভেবেছিস্ ?" হেড্মাষ্টার গর্জন ক'রে উঠলেন, তারপর কিশোরের ঘাড় ধ'রে ঘরের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ব'ললেন,—"যা দূর হ'য়ে যা, ও পাপমুখ আর যেন আমাকে কখন দেখতে না হয়।"

কিশোরকে তাড়িয়ে দিয়ে হেড্মাষ্টার অস্পষ্ট প্রলাপের মত "পাপ, পাপ, নরক" ব'লতে ব'লতে ঘরের মধ্যে এসে একটি আরাম-কেদারায় শুয়ে প'ড়লেন।

সেদিন বাড়ী যাবার আগে তিনি সেখান থেকে আর উঠেননি বা কোন ক্লাশেও পড়াতে যাননি। কেবল স্কুলের ছুটির পর, যখন সকলে চ'লে গেল; তখন সকলের অসাক্ষাতে, অপরাধীর মত সঙ্গোপনে, তিনি কিশোরের নাম আবার স্বহস্তে যথাস্থানে লিখে রেখে গেলেন।

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে কিশোরের প্রথমেই মা'র কথা মনে পড়ল'; মা'র মুখখানা মনে প'ড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের সমস্ত আগুন একেবারে নিবে গেল। সে ভাবলে, যাই ছুটে গিয়ে হেড্মাষ্টারের পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে আসি; কিন্তু একবার সাহসের এক দুরন্ত অভিনয় ক'রে হঠাৎ যেন তার সব সাহস কোথায় গেল' উবে। হেড্-মাষ্টারের কাছে গিয়ে মাপ চাইবার সাহসও যেমন তার ছিল না, এই কালো মুখ নিয়ে এখন হঠাৎ বাড়ী ফিরে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসও তার তেমনি হ'ল না। সে স্কুলেও ফিরে গেল না, বাড়ীর দিকেও গেল না, সোজা একটা নির্জ্জন মাঠ ধ'রে আগিয়ে যেতে লাগল'। তখন চৈত্র মাসের কড়া রোদে চারিদিক খাঁ খাঁ ক'রছে; সমস্ত মাঠটা একটা অলস ঔদাসীন্যে নিঝুম মেরে পড়ে আছে। এমনি ঝাঁঝাল

রৌদ্র এমনি ব্যাপক ঔদাসীন্য কিশোরেরও মনে কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে ছিল। সারা দুপুরটা সে অর্থহীন এলোমেলোভাবে মাঠে মাঠে রোদে রোদে ঘুরেই কাটিয়ে দিলে।

একটা গরিব বিধবা মা ছাড়া সংসারে তার আর কেউ নেই; আর সে ছাড়া মায়ের দীর্ঘ বঞ্চিত জীবনের আর দ্বিতীয় সম্বল ছিল না। মার মুখে শুনেছে তার প্রথম শৈশবে কত কষ্টে কত লোকের হাতে পায়ে ধ'রে তিনি তাকে এই স্কুলে বিনা বেতনে ভর্তি করান। সে আজ ন' বছর আগেকার কথা। আজ নয় বৎসর একাদিক্রমে এইখানেই সে বিনা বেতনে পড়ে আসছে। আর মাত্র কটি মাস বাকী; এই কটি মাস ভালয় ভালয় কাটাতে পারলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারত'। শুধু উত্তীর্ণ নয়, এই নয় বৎসর সবগুলি পরীক্ষায় সে যে অবিচ্ছিন্ন কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছে, তাতে তার সম্বন্ধে সকল শিক্ষকই বেশ ভাল ধারণাই পোষণ ক'রতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ক'লকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বার স্বপ্ন পূর্ণ হওয়া তার পক্ষে খুব বেশী অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তার সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত আশা এমন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে গেল।

আর একটা কথা মনে পড়ায় কিশোরের বড্ড বেশী কষ্ট হ'চ্ছিল। একবার সে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি জীবনী পুরস্কার পায়। পুরস্কার বিতরণের দিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ হেড্ মাষ্টার তাদের বাড়ীতে এসে হাজির। কিশোর তখন দাওয়ায় ব'সে সেদিনকার পুরস্কার-পাওয়া বইগুলি ও পদকখানি মাকে দেখাচ্ছিল। হেড্ মাষ্টারের আগমনে উভয়েই শশব্যস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল'; মা ঘোমটা টেনে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে হেড্ মাষ্টার

ব'ললেন,—"এবার কিশোরকে সার গুরুদাসের একখানা জীবনী দেওয়া হ'য়েছে, এই আশা ক'রে যে, ও ও একদিন সার গুরুদাস হ'য়ে উঠবে।" এই কথায় মায়ের ঘোমটা দেওয়া মুখখানায় কি ভাবান্তর হ'ল দেখা যায় নি, শুধু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনি ব'ললেন,—"ওকে ত' আমি আপনাদের পায়ের ওপর ফেলে দিয়েছি; যদি কোনদিন ও মানুষ হ'তে পারে সে শুধু আপনাদেরই আশীর্বাদে……।"

এখন কিশোরের মনে সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, কোন মুখ নিয়ে সে তার মা'র কাছে ব'লবে এই সদাশয় হেড্ মাষ্টার মশায় আজ তাকে নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বৈকালে চুপি চুপি সে যখন বাড়ীতে এসে ঢুকল', তখন মা বাড়ীতে ছিলেন না। সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরটিতে গিয়ে মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল'। সারাদিনের ক্লান্ত অবসন্ন দেহ শোবার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাভিভূত হ'ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিশোর স্বপ্ন দেখলে যে হেড্ মাষ্টার মশায় রোষ-কষায়িতনেত্রে তাকে সর্বাঙ্গে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত ক'রে যাচ্ছেন; ঘুমের মধ্যে যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করতে লাগল'।

বাড়ীতে এসে কিশোরকে এমনভাবে শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ ক'রতে দেখে তার মায়ের মনটা ছাঁৎ করে উঠল'। তাড়াতাড়ি গায়ের চাপা খুলতে গিয়ে দেখেন গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর খুব বেশী। মা ব'ললেন,—"বাবা কিশোর, কি হ'য়েছে বাবা?"

কিশোর মায়ের হাত দুটি চেপে ধ'রে বললে,—"আর মারবেন না সার, আমি মরে যাব। আর কখ্‌খনো ও সব কথা মুখে আনব' না। এবারের মত আমায় মাপ করুন। আমি প্রহ্লাদ নই, আমি কিশোর।"

পরের দিন হেড্‌মাষ্টার ক্লাসে পড়াতে এসে কিশোরকে দেখতে না পেয়ে আগুন হ'য়ে উঠলেন। তিনি বড় আশা ক'রেছিলেন, আজ কিশোর এসে তাঁর পায়ে ধ'রে মাপ চাইবে, তার চোখের জলে সব পাপ ধুয়ে যাবে, তিনিও তাকে বুকে তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, ছাত্রের পিঠে এক ঘা বেত মারলে সে বেত ক ঘা হ'য়ে শিক্ষকের বুকে এসে বাজে। কালকের সেই ঘটনার পর হেড্‌ মাষ্টার একান্তভাবে এই পরিণতিই আশা ক'রছিলেন। কিশোর সেই আশায়ও নিষ্ঠুর একটা আঘাত ক'রলে। কালকের তার বেআদবির চেয়ে আজকে তার অনুপস্থিতিই হেড্‌ মাষ্টারের উঁচু মাথাটাকে একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। এত বড় একটা আঘাত তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় আর কখন তিনি পান নি। ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেয়ে একটা দুর্জয় অভিমানে তাঁর মন ভ'রে উঠতে লাগল'। কি হ'বে আর পড়িয়ে! শিক্ষকের বুকের বেদনা যে ছাত্র বুঝল' না, সে কি কেবল স্কুলের পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'য়েই জীবনের আসল পরীক্ষায় নিজেকে কৃতী ব'লে পরিচয় দিতে পারবে!

একটা দিনের ঘটনা ছাত্রদের মনে ঠিক এই সময় বারবার মনে প'ড়ছিল। সেদিনও কিশোর স্কুলে আসতে পারে নি। হেড্‌ মাষ্টার চেয়ারে বসেই ব'ললেন,—"হাঁরে কিশোরকে দেখছি না যে?" একটি ছাত্র জবাব দিল,—"তার মায়ের বড় অসুখ, তাই সে আসেনি।" হেড্‌ মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বইখানা ফেলে দিয়ে ব'ললেন,—"তবে আর কাকে পড়াব? তোরা ত' যত সব গরুর দল; না পারবি এক বর্ণ বুঝতে, না পারবি একটা কথার জবাব দিতে; কেবল হাঁ ক'রে মুখের পানে তাকিয়ে থাকবি।" বলেই তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ এমনি নির্লিপ্তভাবে বসে থাকবার পর, হঠাৎ তিনি একটি ছাত্রের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন,—"কি পড়াশোনা আজ আর হবে না, দিব্যি লাটসাহেবের মত ব'সে ব'সে আরাম ক'রলেই, বেশ চলে যাবে, না ?"

ছেলেটি থতমত খেয়ে একখানি ইংরাজি কবিতার বই এনে তাঁর হাতে দিল। তিনি একটি ইংরাজি কবিতা প'ড়ে তার অর্থ ক'রে শোনাতে লাগলেন। এমন সহজ প্রাঞ্জলভাবে তিনি ইংরাজ কবির মনের ভাব ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলেন, যে ছাত্রেরা মুগ্ধ হ'য়ে গেল; কিন্তু তিনি নিজে খুসী হ'তে পারলেন না। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগল', এত কথা বলছি, কিন্তু শোনবার মত ছেলে কৈ ? যাকে শোনালে কাজ হ'ত, সে কৈ ?

এমনি ধারা মনমরা হ'য়ে সাতদিন তিনি কিশোর-শূন্য ক্লাসে অধ্যাপনা ক'রে গেলেন। একদিন আর থাকতে পারলেন না, সমস্ত অভিমান ত্যাগ ক'রে তিনি ব'ললেন,—"হাঁরে, কদিন ধ'রে কিশোরকে যে দেখছি না ? তার কি খবর, তোরা কেউ জানিস ?"

একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—"তার বড্ড জর ; সাতদিনের মধ্যে একবারও জর ছাড়ে নি।"

শুনেই তিনি দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলেন,—"তা এই কথাটা সাতদিনের মধ্যে একবার আমাকে শোনাতে কি হয়েছিল ? আমি কি একেবারে মরে গেছি ? সাতদিন ধ'রে ছেলেটা ক্লাসে আস্‌ছে না, তার একটা খোঁজ নেই ?"

কিছুক্ষণ তিনি গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলেন, তারপর অত্যন্ত কোমল স্বরে ব'ললেন,—"হ্যাঁরে, জর কি একবারও ছাড়ছে না ?"

ছেলেটি মাথা নেড়ে বললে,—"না, সার।"

হেড্ মাষ্টার শুধু ব'ললেন,—"আমাকে জব্দ ক'রতে চায়, ছোঁড়াটার এতই জেদ।" বলে সোজা উঠে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আপনার নির্দিষ্ট কক্ষটিতে এসে হেড্ মাষ্টার অন্য কাজে মন দেবার চেষ্টা ক'রলেন। সামনেই গরমের ছুটী তারপূর্বে ছাত্রদের একটা পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় কোন শিক্ষককে কোন প্রশ্ন-পত্র দেওয়া যাবে তারই একটা তালিকা ক'রতে লাগলেন। হঠাৎ গৃহকোণে তাঁর বহুদিনের সঙ্গী সেই সরু লিক্‌লিকে বেতখানি চোখে পড়ল'। তাঁর আর তালিকা করা হ'ল না, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে কিশোরের বাড়ীর দিকে ছুটলেন।

কিশোরদের গৃহপ্রাঙ্গণে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতে পেলেন তার বিকৃত ভগ্ন অথচ তীব্র আর্তনাদ,—"আর মারবেন না সার, আর মারবেন না। আমায় এই বারের মত মাপ করুন। আমি প্রহ্লাদ নই, আমি আপনাদের কিশোর।" তারপর তার মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"চুপ কর বাবা, একটুখানি চুপ কর; দিনরাতই কি এমনি করে চেঁচায়!"

"মা, তুমি হেড্ মাষ্টার মশায়কে বারণ কর, ঐ যে আবার বেত তুলে ধ'রেছেন, ওরে বাবারে, আর সইতে পারছি না, এইবার আমি মরে যাব!"

অলক্ষ্যে কার উদ্যত হস্তের বেত্রাঘাত সজোরে এসে হেড্ মাষ্টারের বুকে পড়ল'। তিনি আর একপাও এগোতে পারলেন না; শুধু তাঁর নিষ্পলক চোখদুটি দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল গড়াতে লাগল'।

এদিকে কিশোরের মায়ের যে এই কটাদিন কি ক'রে কাটছিল, তা বেশী কথায় না বলাই ভাল। কিশোরের জ্বরেরও বিরাম নেই,

প্রলাপেরও বিরাম নেই। এমনি অবিরাম জ্বরে বার-বছর আগে কিশোরের বাবার কাল হয়। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির স্মৃতি মা'র মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি আর তা ভুলতে দিলে না। প্রতিদিনই মা আশা করেন আজ ভোররাত্রে তাঁর কিশোরের জ্বর ছাড়বে ; প্রতিদিনই সেই আশায় সারারাত জেগে ব'সে পুত্রের মাথায় বাতাস ক'রতে ক'রতে কতক্ষণে জ্বর ছাড়বে তার প্রতীক্ষা ক'রতে থাকেন। তারপর ভোররাত্রে তাঁর ক্লান্ত অবসন্ন দেহ পুত্রের রোগশয্যার পাশে নেতিয়ে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত চোখের পাতার ওপর ভেসে ওঠে, বার বছর আগের স্বামীর মৃত্যু-শয্যার দৃশ্য। আর তাঁর ঘুম হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে পুত্রের তপ্ত কপালে হাত রেখে ইষ্ট দেবতার নাম ক'রতে থাকেন। তারপর যতক্ষণ না সকাল হয়, যতক্ষণ না ডাক্তার এসে ব'লে যায়,—"না, না, ভয়ের ত' কিছু কারণ দেখছি না।" ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ের মন শান্ত হ'তে চায় না। ঠায় ব'সে থেকে থেকে মায়ের অবসন্ন মনের উপর কত কি দুশ্চিন্তা জেগে ওঠে, চোখের পাতা কতবার ভিজে ওঠে, কতবার শুখিয়ে যায়, তার আর হিসেব থাকে না।

প্রতিদিন সকালে মায়ের এই অশান্ত মনকে কতকটা শান্ত ক'রে ডাক্তার ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখেন, আর একটি অশান্ত প্রাণী লাঠির উপর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মাথার ভারটি রেখে তাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

ডাক্তার ফিরে এলে হেড্ মাষ্টার প্রথমেই তাঁর হাতে দুটো টাকা একরকম জোর ক'রেই গুঁজে দেন। ডাক্তার মামুলী আপত্তি তোলে, —"ও আপনার কে যে ওর জন্যে রোজ রোজ আপনি এত খরচান্ত হ'চ্ছেন ?"

—"ও আমার কেউ নয় ডাক্তার, তবে ও যেদিন ইউনিভার্সিটী

থেকে ফার্ষ্ট-হ'য়ে ফিরে আসবে সেদিন সকলের থেকে আমারই মুখখানা উজ্জ্বল হবে বেশী।"

ডাক্তার হেড্ মাষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে দু একটা প্রশংসার কথা ব'লতে যান্, আমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেড্ মাষ্টার বলেন,—"ও সব বাজে কথা থাক, এখন কবে ওকে খাড়া ক'রে তুলতে পারবে বল দেখি ?"

ডাক্তার বলেন,—"টাইফয়েড্ জ্বরে ঠিক ক'রে কিছুই কি বলা যায়, সবই ভগবানের হাত।"

তারপর হেড্ মাষ্টার মুখখানি কাল ক'রে বেরিয়ে পড়েন।

আজ কদিন ধ'রে সকাল বেলায় হেড্ মাষ্টারের আর কোন কাজ নেই। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাঁকে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ডাক্তারখানার দিকে আসতে দেখা যায়, আর প্রতিদিন এমনি কাল মুখ ক'রে তাঁকে ফিরতে দেখা যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ধীরপাদবিক্ষেপে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল, যেদিন ডাক্তার এসে খবর দিলেন, কাল ভোররাত্রে কিশোরের জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে, আর বোধ হয় আসবে না।

সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে হেড্ মাষ্টার ডাক্তারখানায় ব'সে ব'সে গল্প ক'রলেন। গল্পের মধ্যে চৌদ্দ আনা ছিল কিশোরের পড়াশোনার আর ডাক্তারের হাতযশের সুখ্যাতি।

জ্বর ছাড়বার পর যেদিন কিশোর ডাক্তারের কাছ থেকে অন্নপথ্য করবার অনুমতি পেলে সেইদিনই তাদের স্কুল খুল্‌ল' দেড়মাস গরমের ছুটীর পর।

ভাত খেয়ে উঠেই কিশোর বই বগলে মা'র কাছে এসে বল্‌লে,—"মা, স্কুলে যাচ্ছি।"

মা চমকে উঠলেন,—"সে কি রে, এখনও যে তুই একটুও সারতে পারিস নি।"

"ঘরের মধ্যে আটক থাকলে কোনদিনই পারব' না।"

"তা হ'ক, আর কটা দিন যাক্।"

"আর কটা মাস বাদ আমাদের ম্যাট্রিক্, তার কি কোন খোঁজ রাখ তুমি?" ব'লে কিশোর মা'র কোন নিষেধ না শুনে বেরিয়ে পড়ল'।

মা নিরুপায় হ'য়ে চেঁচিয়ে ব'ললেন,—"মা'র কথা না শুনলে কি হয় জানিস্?"

"যমের বাড়ী যেতে হয়",—দূর থেকে চিৎকার ক'রে জবাব দিয়ে কিশোর স্কুলের দিকে ছুটল'।

মা'র কথা না শুনলে যে একটা কিছু অনর্থ হয়, এ বিশ্বাস কিশোরের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল; তাই মায়ের অবাধ্য সে কখন হ'ত না। কিন্তু অসুখ থেকে উঠে অবধি তার মেজাজটা এত খিটখিটে হ'য়ে উঠেছিল যে আজকাল সে মা'র উপরও কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে।

স্কুলে গিয়েই প্রথম পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা। কিশোর তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। পণ্ডিত মশায় কুশল প্রশ্নের পর তাকে হেড্ মাষ্টারের ঘরের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ ক'রে ব'ললেন,—"যা হেড্ মাষ্টার মশায়ের কাছে যা।"

অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে হাসিমুখে কিশোর হেড্ মাষ্টারের ঘরে ঢুকল'। পায়ের শব্দে হেড্ মাষ্টার একবার শুধু মুখ তুলে চাইলেন,

তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলেন; কিশোরকে যেন তিনি দেখেও দেখলেন না। এই অবহেলায় কিশোরের মনটা তিক্ত হ'য়ে উঠল'। সে আর কিছুতেই এগিয়ে গিয়ে হেড্ মাষ্টারের পা ছুঁয়ে নত হ'য়ে একটা প্রণাম ক'রতে পারলে না; তীব্র একটা অভিমান জোর ক'রে তাকে টেনে রেখে দিল।

হেড্ মাষ্টার ভ্রূক্ষেপও ক'রলেন না, টেবিলের ধারে ব'সে আপন মনে কাজ ক'রে যেতে লাগলেন, আর নিজের এই অবহেলার দ্বারা কিশোরকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে কিশোর তাঁর স্কুলের বহু ছাত্রের মধ্যে একজন নগণ্য ছাত্রমাত্র; তার দিকে ফিরে দেখবার অবসর বা আকর্ষণ কিছুই হেড্ মাষ্টারের নেই।

আসলে কিন্তু কাজের দিকে হেড্ মাষ্টারের মন ছিল না, অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে তিনি তখন ভাবছিলেন, ভগবানের হাতে এতখানি শাস্তি পেয়েও আজও ওর দুর্বিনীত স্বভাব গেল' না, আজও ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল' না, আজও তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে ক্ষমা চাইবার মত শিষ্টাচার ও ত' আয়ত্ত ক'রতে পারলে না।

ছাত্র ভাবতে লাগল',—"কি পাষাণ তাদের এই হেড্ মাষ্টার! এত যে সে কষ্ট পেলে তবুও কি মনে একটু দয়া হয় না।" শিক্ষক ভাবতে লাগলেন,—"কি একগুঁয়ে তাঁর এই ছাত্রটি! এই অশিষ্ট স্বভাব নিয়ে বড় হ'য়ে সে পরিচয় দেবে তাঁরই ছাত্র ব'লে।"

ঢং ঢং ক'রে এগারটা কুড়ির ঘণ্টা প'ড়ল'। হেড্ মাষ্টার শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন, টেবিল থেকে নির্দিষ্ট একখানা পাঠ্যপুস্তক বেছে নিয়ে ঘর থেকে বেরবার সময় দ্বারের কাছে যেন কিছুতেই কিশোরকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না।

"এই যে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, আবার এখানে কি মনে ক'রে ? যমে ত' ধ'রে টানাটানি ক'রলে, গেলে না কেন ? একটা গোমুখ্খুকে শিক্ষা দেবার বিড়ম্বনা থেকে আমিও রেহাই পেতুম।"

কিশোর মাথা হেঁট ক'রে এই তিরস্কার গ্রহণ ক'রলে। হেড্ মাষ্টার তার কানটা ধ'রে টান দিয়ে, ব'ললেন,—"আয়, ক্লাশে আয় আমার সঙ্গে।"

কিশোর জোর ক'রে মাথা নেড়ে কান ছাড়িয়ে নিলে, দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললে,—"আমি গোমুখ্খু আছি, গোমুখ্খুই থাকব', তবু কখন আপনার ছাত্র ব'লে আর পরিচয় দেব' না ; মা সরস্বতী আমার মাথায় থাক, এত অবিচার আর আমি সইতে পারব' না।"

এই ব'লে হতবুদ্ধি হেড্ মাষ্টারকে আর দ্বিরুক্তি করবার সুযোগ না দিয়ে কিশোর হন্ হন্ ক'রে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল, হেড্ মাষ্টারের চোখের সামনে দিয়ে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে প'ড়ে কিশোর হন্যের মত চ'লেছিল দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ; পথে আবার এক নূতন বিপদ দেখা দিল।

গ্রামের বড় পুকুরটার পাড় দিয়ে যখন সে যাচ্ছিল, তখন ঘাটে হেড্-মাষ্টার-পত্নী এসেছিলেন জল নিতে। সদ্য রোগমুক্ত কিশোরকে এমন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে যেতে দেখে তাঁর বড় কৌতূহল হ'ল, আশঙ্কাও বড় কম হ'ল না ; তিনি ঘাট থেকে উঠে এসে ডাক দিলেন,—"এই যে বাবা কিশোর, এমন হন্ হন্ ক'রে যাচ্ছ কোথা ?···কেমন আছ, কেমন ?"

কিশোর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—"আর অত আদর কেন ? হেড্

মাষ্টার মশায় ত' উঠতে ব'সতে আমার মরণ কামনা ক'রছেন। তাঁরই অভিশাপে ত' আমি এত বড় অসুখে পড়েছিলুম।"

স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে অতটুকু সময়ের মধ্যে পড়িয়ে যেদিন হেড্ মাষ্টারের আশ মিটত' না, সেদিন তিনি কিশোরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন; সেখানে আপনার শয়নকক্ষে ব'সে কিশোরকে অনেকরাত পর্য্যন্ত পড়াতেন। পড়ান' শেষ হ'লে, শিক্ষক ও ছাত্রকে কাছে বসিয়ে হেড্-মাষ্টার-পত্নী কত যত্ন ক'রে, নিজের হাতের রান্না খাওয়াতেন। হেড্-মাষ্টার-পত্নীর উপর কিশোর মায়ের মতই আব্দার ক'রত', মায়ের মতই জোর খাটাত'। হেড্-মাষ্টার-পত্নীও কিশোরকে নিজের ছেলে ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। সেই কিশোরের মুখে আজ একি কথা!

হেড-মাষ্টার-পত্নী চমকে উঠলেন,—"সেকি কথা বাবা! তোমার অসুখের সময় যে দুশ্চিন্তায় তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। তোমার অসুখটা যখন বাড়ল' তখন তিনি দিনের বেলা ভাল ক'রে খেতে পারতেন না। উঠতে বসতে তাঁর মুখে কেবল কিশোর, আর কিশোর ছাড়া আর অন্য কথা ছিল না।"

হঠাৎ জলের উপর ঝুপ্ ক'রে একটা শব্দ হওয়ায় কিশোর ও হেড-মাষ্টার-পত্নী উভয়েই একসঙ্গে চমকে উঠলেন। কিশোর চীৎকার ক'রে উঠল',—"গেল, গেল, ছেলেটা ডুবে গেল।"

হেড্ মাষ্টারের তিন বৎসরের শিশুপুত্র মায়ের সঙ্গে ঘাটে এসেছিল। মায়ের অলক্ষিতে কখন যে সে শেষ ধাপটিতে নেমে গেল, কখন যে সে একটা বুড়ো ঘটী নিয়ে জল তুলতে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল, কিছুই মা লক্ষ্য করেন নি, হঠাৎ কিশোরের চীৎকারে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, ঘাটে ছেলে নেই, খানিকটা দূরে পুকুরের একস্থান থেকে জলের বুদ্বুদ উঠছে।

মা চীৎকার ক'রে উঠলেন। কিশোর মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না ক'রে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল'। অসুখের আগে সাঁতারে গ্রামে তার জোড়া ছিল না; আজ এই বিপদের সময় কোথা থেকে তার সেই লুপ্তশক্তি ফিরে এল। প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকক্ষণ জল তোলপাড় ক'রে কিশোর হেড্ মাষ্টারের শিশুপুত্রকে জীবিত অবস্থায় এনে তার মায়ের কোলের উপর তুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার নিজের শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। চোখের সামনে হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীর আলো নিবে গেল; মায়ের উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদের এক বর্ণও তার কানে গেল না। সে অতিকষ্টে সিঁড়ির একটি ধাপ ধ'রে ফেলে নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচালে। তারপর কি হ'ল সে আর কিছু জানে না।

ইতিমধ্যে বহুলোক মায়ের চীৎকারে ঘাটে এসে জমা হ'য়ে গেছে। কয়েকজন ধরাধরি ক'রে কিশোরের হতচৈতন্য দেহ তার বাড়ীতে তার সদ্যছাড়া রুগ্ন শয্যায় এনে শুইয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডাকা হ'ল এবং দুই ঘণ্টা সেবাশুশ্রূষার পর তবে তার জ্ঞান ফিরে এল'।

সেই রাত্রে কিশোরের আবার জ্বর এল'। ডাক্তার মুখখানি কাল ক'রে অনেক রাত্রে বাড়ী চলে গেলেন।

টায়ফয়েডে একবার ভাল হ'য়ে আবার পাণ্টা প'ড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়। কিশোরের বেলায়ও তাই হ'ল।

সেদিন সকালে গ্রামের কয়েকটি ছেলে কিশোরের মৃতদেহ নিয়ে যখন নীরবে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে হেড্ মাষ্টারের সঙ্গে তাদের দেখা হ'য়ে গেল। তিনি তখনও এ খবর পাননি। তখন দশটা বেজেছে, তিনি স্কুলে যাচ্ছিলেন; তাঁর আর স্কুলে যাওয়া হ'ল না; তিনি নীরবে শ্মশানযাত্রীদের অনুগমন ক'রলেন।

শ্মশানে এসে মৃতদেহটি যখন নামান হ'ল, হেড্ মাষ্টার আস্তে আস্তে তার মুখের চাপাটি খুলে ফেললেন। তারপর তার মাথার উপর হাতটি রেখে ব'ললেন,—"বাবা কিশোর, শুধু আমার মুখের তিরস্কারই শুনে গেলি, আমার মনের আকুলতা কি একটুও দেখতে পেলি না, বাবা?"

পরের দিন থেকে স্কুলের প্রেসিডেন্ট্ ও সেক্রেটারীর বাড়ী হেড্ মাষ্টার হাঁটাহাঁটী আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁকে এইবার ছুটি দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট্ ও সেক্রেটারী প্রথমে কিছুতেই রাজী হন্ নি। কিন্তু হেড্ মাষ্টার এক কথার মানুষ, মুখ থেকে তিনি যে কথা খসান, তার আর নড়চড় হয় না। কাজেই সম্মতি দিতে হ'ল। গত পঁচিশ বছর যাবৎ হেড্ মাষ্টার মশায় এই স্কুলটির সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন যে, হেড্ মাষ্টার ব'লতে তাঁর ঐ স্কুলটিকে আর স্কুল ব'লতে লোকে ঐ হেড্ মাষ্টারটিকেই বুঝত'। ছাত্রদের অধ্যাপনা ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধানের জন্যে সুদূর ক'লকাতা পর্যন্ত তাঁর ও তাঁর স্কুলটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এই সুনামের জন্যে একবার ক'লকাতার কোন বিখ্যাত বিদ্যালয় চতুর্গুণ বেশী বেতনের এক প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ক'রতে চেয়েছিল; সে প্রস্তাব প্রত্যাখান ক'রে যে ছোট্ট চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন, তাতে কেবল মহাভারত থেকে একটী শ্লোক উদ্ধার ক'রে দেওয়া ছিল; শ্লোকটীর মর্ম,—"শঙ্করের আজ্ঞায় বরং কীট বা পতঙ্গ হ'য়ে থাকব', তথাপি হে ইন্দ্র, আপনার দেওয়া ত্রিভুবনের আধিপত্যও আমি চাইনা।"

এই ঘটনায় সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন, স্কুলটীর প্রতি তাঁর মমতা ছিল কত গভীর। কিন্তু আজ যে তিনি কেন সেই ক'লকাতার

কোন এক অখ্যাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি সামান্য বেতনে সর্বনিম্ন-শিক্ষকের পদ গ্রহণ ক'রে ক'লকাতার বিরাট জনসমাজে আত্মগোপন ক'রতে চাইছেন, সেই "কেন"'র জবাব কাউকেও স্পষ্টভাবে দিলেন না, হয়ত' দিতে পারলেন না।

যাবার আগের দিন। হেড্ মাষ্টারের বহু আপত্তি ও নিষেধ সত্ত্বেও স্কুলের খেলবার মাঠে একটা সভার আয়োজন হ'য়েছে। সভায় স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ও গ্রামের প্রায় সমস্ত বয়স্থ পুরুষ অধিবাসী উপস্থিত। সভাপতি হয়েছেন গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার; তিনিই স্কুলের প্রেসিডেণ্ট্।

প্রথমেই সভাপতি ব'লতে উঠে হেড্ মাষ্টারের বহুবিধ গুণাবলী বর্ণনা ক'রলেন। তাঁর অভাবে এই স্কুলটির তথা সমগ্র গ্রামটির যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে, সেই কথা ব'লতে ব'লতে তাঁর ভাষা আবেগময় হ'য়ে উঠল'। তিনি যখন ব'ললেন, হেড্ মাষ্টার মশায় ছিলেন স্কুলটির একটি স্তম্ভ, সেই মূল স্তম্ভ আজ খসে পড়ছে; তখন যে কেবল বক্তার কণ্ঠই বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছিল তা নয় শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই চোখের কোলগুলি জলে ভরে উঠছিল।

সভাপতির পর হেড্ মাষ্টার মশায় ব'লতে উঠলেন। এই স্কুল ছেড়ে যেতে আজ যে তাঁর কি কষ্ট সে কথা কাউকে বোঝাতেও পারছেন না ব'লতেও পারছেন না, অথচ এই অব্যক্ত বেদনার যে স্পষ্ট ছাপ তাঁর মুখে করুণভাবে ফুটে উঠেছিল কারোরই চোখে সেটা এড়িয়ে গেল না। যাঁর ভীতিপ্রদ শাসন-কঠিন মূর্তি দেখে দেখেই ছাত্ররা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে; আজ সহসা তাঁর এই পরিবর্তনও ছাত্রদের কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। যিনি কোন কারণে একদিন স্কুলে অনুপস্থিত হ'লে, ছাত্রেরা আনন্দে নৃত্য সুরু ক'রে দিত; আজ তাঁর

চিরদিনের জন্য স্কুল থেকে বিদায় নেবার আয়োজনটাও ছোট বড় সকল ছাত্রের কাছে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ব'লে মনে হ'চ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে, ছাত্রেরা তাঁকে ভয় যতই করুক ভালও কম বাসত না।

ব'লতে উঠে প্রথমে হেড্ মাষ্টারের মুখে কোন কথাই ফুটল' না। বুকের ভিতর থেকে কান্নার একটা বাষ্প উঠে তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। অতি কষ্টে সেই ভাবকে কাটিয়ে তিনি যখন ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে ব'ললেন,—"বালক নারায়ণগণ!" তখন আর কিছুতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না; শিশুর মত আকুলভাবে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না দেখে তাঁর সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী এক সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলে; বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই চোখ মুছতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য; যে দেখেনি, তাকে বোঝান যাবে না, যে দেখেছে, সে কখন ভুলতে পারবে না।

একটু সামলে নিয়ে হেড্ মাষ্টার আবার ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন —"বালক নারায়ণগণ, আজ পঁচিশ বৎসর একাদিক্রমে আমি তোমাদের সেবা ক'রে এসেছি। এতদিন আমার একটা অভিমান ছিল যে, এ সেবার ভার বহন করবার শক্তি ও যোগ্যতা আমার আছে। আজ কদিন হ'ল, ভগবান একটা নিষ্ঠুর আঘাতে আমার সে অভিমান ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

এরপর বহু চেষ্টা করেও হেড্ মাষ্টার আর এক বর্ণও ব'লতে পারলেন না; কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টার পর কাঁদতে কাঁদতে তিনি বসে পড়লেন।

ছাত্রদের কান্নার আওয়াজে সভায় একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

সভাপতি তখন উঠে ব'ললেন,—"বালকগণ, তোমরা শান্ত হও, তোমাদের হেড্ মাষ্টার মশায় তোমাদের ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবেন না। তাঁকে রাজি করবার ভার আমার উপর দিয়ে তোমরা

নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী যাও। আজকের মত সভাভঙ্গ হ'ক।" এই ব'লে তিনি চোখ মুছতে মুছতে সভা ত্যাগ ক'রলেন। এ দৃশ্য দেখা তাঁর পক্ষেও কষ্টকর হচ্ছিল।

সভাভঙ্গের পর ছাত্রেরা সব হেড্ মাষ্টারকে ঘিরে কেউ কোলে মাথা রেখে, কেউ পায়ে মাথা দিয়ে কান্না জুড়ে দিলে ; কিছুতেই তারা হেড্ মাষ্টারকে ছেড়ে দেবে না।

ছাত্রদের ভোলাতে হেড্ মাষ্টার অন্য প্রসঙ্গ তুললেন ; কত গল্প ব'ললেন, কত উপদেশ দিলেন ; আর সব কথার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শটাকে, যাবার আগে নানাভাবে ছাত্রদের মনে গেঁথে দিয়ে যেতে চাইলেন :—

"সংসারে যদি মানুষ হ'য়ে উঠতে চাস্, বাপমার মনে কখন কষ্ট দিবিনি, তাঁদেরকে দেবতার মত মন্য ক'রে চলবি। সংসারে আর অন্য দেবতা নেই, অন্য ধর্ম নেই। বিদ্যাসাগর মশায়ের কথাত' তোদের কতবার ব'লেছি ; মাকে তিনি অন্নপূর্ণা আর বাপকে বিশ্বনাথ জ্ঞান ক'রতেন। তাঁর মত মহাপুরুষ সারা ভারতে আর কজন জন্মেছে বাবা ?"

এমনিভাবে কত কথা ব'লে ; প্রত্যেক ছাত্রটীকে কাছে ডেকে তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে, কত আশীর্ব্বাদ ক'রে, কত ক'রে বুঝিয়ে, একে একে সকলকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

সকলে চলে গেলে হেড্ মাষ্টার মশায় আস্তে আস্তে উঠে গ্রামের প্রান্তভাগে ছিদামের বাড়ী গিয়ে দুখানি গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলেন।

সেই দিনই ভোর রাত্রে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে সেই দুখানি

গরুর গাড়ী যখন হেড্ মাষ্টারের বাড়ী ছেড়ে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করল', তখনও গ্রামের কেউ জাগেনি।

এর পর গ্রামের লোকেরা অনেক অনুসন্ধান ক'রেছিলেন, কিন্তু হেড্ মাষ্টারের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

ক'লকাতায় যে মাইনর্ স্কুলে তিনি চাকরী নিয়ে এসেছিলেন, সেখানে খোঁজ ক'রে জানা গেল যে, তিনি সেখানে মাত্র একদিন পড়িয়েছিলেন। সেখানে না কি পড়াবার মত ছাত্র একজনকেও দেখতে না পাওয়ায়, বাধ্য হ'য়েই তাঁকে সে চাকরী ছেড়ে দিতে হ'য়েছিল। তারপরে যে তিনি কোথায় গেলেন, তা আর কেউ ব'লতে পারে না।

কয়েকমাস পরে শোনা গেল, সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যেদিন্ বের হয়, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বহু জনতার মাঝখানে একজন লোককে উন্মাদের মত এদিকে ওদিকে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল; তিনি সকলকেই জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন,—"হাঁ মশায়, ব'লতে পারেন, এবার কি আমার কিশোর ফার্ষ্ট হ'য়েছে?"

মুখে মুখে এ খবর যখন বাঘনাপাড়ায় পৌছল', তখন গ্রামের লোকেরা সকলেই ব'ললেন,—"এ আমাদের হেড্ মাষ্টার মশায় ছাড়া আর কেউ নন্।"

ফেল্-করা-ছেলে

আফিস্ থেকে বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই গর্জন শোনা গেল,—"য়্যাঁ, বলিস্ কি, এবারেও প্রমোশন্ পায় নি! কোথায় সে? ডাক ত' দেখি একবার গাধাটাকে।"

স্কুল থেকে ফিরে অবধি সনৎকুমার মা'র কাছটিতে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে। বাবা আফিস্ থেকে ফিরলেই যে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হ'বে ব'লে সে মনে মনে আশঙ্কা ক'রছিল, তার থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় মা। আজ তাই জন্যে সে মা'র কাছ ছেড়ে কোথাও নড়ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাপকে তার ফেল করার খবর শোনান'র বিপদ না কাটে।

বাপের গলার স্বর শুনেই সনৎ মা'র কাছে আরও একটু ঘেঁসে ব'সল।

ছোটভাই জরৎকুমার এসে বললে,—"চল, বাবা তোমাকে ডাকছেন।"

মা বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন,—"বাড়ীতে পা দিতে না দিতে কে অমনি কুট ক'রে ওর কানে লাগালে? লোকটা তেতে পুড়ে এলো, একটু জিরোতেই দেরে বাপু।"

কুট ক'রে যে লাগিয়েছে সে নিজে গত ক'বছরের মত এবারেও বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'য়েছে। শুধু ফার্ষ্ট নয়, প্রত্যেকটি বিষয়ে সে এত বেশী নম্বর পেয়েছে যা সত্যিই গর্ব করবার মত। জরৎকুমার তাই প্রগ্রেস্ রিপোর্টখানি হাতে ক'রে সদর দরজায় বাপের প্রতীক্ষা ক'রছিল। স্কুল থেকে লাফাতে লাফাতে এসে মাকে এই সুখবর দিতে মা'র কাছ থেকে সে আশানুরূপ সমাদর পায়নি। মায়ের সমস্ত মনটা তার ফেল্ করা দাদার জন্যেই ব্যথায় ভরে উঠেছিল। সনতের ছলছলে চোখ দুটি দেখে মা তাকেই কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। জরতের লাফালাফি আনন্দে মাতামাতি তখন তাঁর চোখে ভাল ঠেকছিল না।

মায়ের কাছে বঞ্চিত হ'য়ে জরৎ বাপের পথ চেয়ে ব'সেছিল। বাপ বাড়ীতে পা দিতে না দিতে, সে দৌড়ে গিয়ে দুহাতে বাবার কোমর জড়িয়ে ধ'রে বললে,—"বাবা, আমি এবারেও ফার্ষ্ট হ'য়েছি, এই দেখ আমার প্রগ্রেস্ রিপোর্ট।"

রিপোর্ট দেখে বাবার মুখখানি খুসিতে ভ'রে গেল, তিনি জরতের গালদুটী দুহাতে ধ'রে একটুখানি নেড়ে দিয়ে ব'ললেন,—"ভেরী গুড, মাই কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্!" তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"আর সনতের কি হ'ল রে?"

মুখখানি বেঁকিয়ে জরৎ বললে,—"দাদা, এবারও ফেল হ'য়েছে।"

শুনেই ত' তিনি দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন; প্রথমে খুব খানিকটা

চীৎকার ক'রে, শেষে জরৎকে ব'ললেন,—"যা, ধ'রে নিয়ে আয় গাধাটাকে, দেখি তাকে একবার।"

তাকে আর ধ'রে আনবার সবুর সইল না, বাপ নিজেই গিয়ে হাজির হ'লেন।

মায়ের কোল ঘেঁসে সনৎ মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে; তাকে লাঠির একটা খোঁচা দিয়ে বাবা ব'ললেন,—"কি! এবারেও ফেল ক'রে ব'সে আছ ত?"

লাঠির দু এক ঘা হয়ত' সেই সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে পড়ত', কিন্তু মা বাঁচিয়ে দিলেন।

তিনি ব'ললেন,—"তা, আর কি হবে? সব ছেলের কি মাথা সমান, না সকলের সমান লেখা পড়া হয়?"

এই কথায় বাবা আরও তেতে উঠলেন,—"তুমিই ত' আদর দিয়ে ওর সর্বনাশ ক'রছো। বড় হ'লে কি খাবে তা একবার ভেবেছ? রিক্‌সা টানবে, না মোট বইবে?"

মা শান্তস্বরে ব'ললেন,—"তা যা ভাগ্যে আছে, হবে। এখন থেকে ভাবলে কি হবে? আমরা কিছু ওর ক'রে যেতে না পারি, ভগবান্‌ আছেন, দেখবেন।"

"ভগবানের ব'য়ে গেছে, ঐ সব ফেল্‌-করা-গবেট্‌গুলোর জন্যে মাথা ঘামাতে। গড্‌ হেল্‌প্‌স্‌ দোস্‌ হু হেল্‌প্‌স্‌ দেম্‌সেল্‌ভ্‌স্‌।"

আফিসের পোষাক ব'দলে সন্ধ্যার চা-পান শেষ ক'রে বাবা ব'ললেন,—"জরৎ, রেডি হ'য়ে নাও, আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।"

মা শুনতে পেয়ে ব'ললেন,—"কোথায় যাবে?"

"জরৎকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যাব।"

"বেশ, যাচ্ছ যদি দুজনকেই নিয়ে যাও, সনৎ বেচারী সেই থেকে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ব'সে আছে ; ওর মনটা একটু ভাল হবে।"

সেই শুনে বাবা আবার গর্জন ক'রে উঠলেন,—"ওর নাম তুমি আমার সামনে ক'রোনা। ও আমার বংশে কালী দিতে জন্মেছে।"

মাও সেই কথায় রেগে উঠলেন,—"কি যে বল' তার ঠিক নেই ; এক্‌জামিনে একবার ফেল্ ক'রেছে ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে ?"

"একবার ! একবার ফেল্ ক'রলে তবু বুঝতুম। ঐ থার্ড ক্লাশে ও দু দুবার ফেল্ ক'রলে ! এইবার পড়ুক ছোটভায়ের সঙ্গে। ছোট-ভায়ের কাছে কানমলা না খেলে কি আর ও সব ছেলের আক্কেল হবে ?"

এই সময় সনৎ সেখানে এসে দাঁড়াতেই বাবা ভাষায় একটু শ্লেষ মিশিয়ে ব'ললেন,—"কি, তুমি না কি সার্কাস্ দেখতে চাও ? আচ্ছা দেখাচ্ছি সার্কাস।" এই ব'লে জরৎকে ডাক দিলেন ; জরৎ আসতে ব'ললেন,—"যা ত' জরৎ, তোর দাদার মাথায় একটা গাধার টুপি পরিয়ে কান ধ'রে ঐ চাকর-দরওয়ান্‌দের ঘর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয় ত'।"

জরৎ দাদার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল'।

মা ধমকে উঠলেন,—"খবরদার জরৎ, বড় ভায়ের কানে হাত দিলে তোমার ভাল হবে না, ব'লছি।"

ধমক খেয়ে জরৎ ছুটে পালিয়ে গেল।

•

জরৎ আর বাবাকে নিয়ে তাদের বড় কাল রঙের গাড়ীখানা হর্ণ বাজিয়ে যখন ফটক পার হ'য়ে গেল, তখন সনৎকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা ব'ললেন,—"তুই দুঃখু ক'রিস্‌নি সনৎ, কাল আমি

কালীঘাটে যাব, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবরে। কি হবে সার্কাস দেখে, বাঁদর ভাল্লুকের নাচ? কাল কেমন আমার সঙ্গে গিয়ে 'মা'কে দর্শন করবি, কত আনন্দ পাবি।"

•

গাড়ীতে যেতে যেতে বাবা জরৎকে ব'ললেন,—"এ পোষাকে তোকে ত' তেমন স্মার্ট দেখাচ্ছে না, জরৎ? তোর মা নিজে যেমন একটি জন্তু, তেমনি ছেলে দুটোকে জন্তু ক'রে রাখতে ভালবাসে।"

যাবার সময় বাবা বলে গেছেন রাত্রে তাঁরা হোটেলে খাবেন; তাই রাত হ'তে মা আর সনৎ খেয়ে দেয়ে শুয়ে প'ড়ল'। মার কাছে শুয়ে সনৎ গল্প শুনতে লাগল'। মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাঁর শৈশবকাল পাড়াগাঁয়ে কেটেছে। সনৎ কখন পল্লীগ্রাম দেখেনি। মা শুয়ে শুয়ে সনৎকে তাঁর ছেলেবেলাকার গল্প, পাড়াগাঁয়ের গল্প শোনাতে লাগলেন; শুনতে শুনতে সনতের মনটা শান্ত হ'ল। সে ফেল্‌ করার দুঃখ, সারাদিনটার অপমান লজ্জা অবহেলা তিরস্কার সব ভুলে গেল। মায়ের কোল ঘেঁসে অবোধ শিশুর মত সে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

এদিকে জরৎকে তার বাবা চাঁদনীচকে একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে একটি মূল্যবান্‌ পোষাক কিনে দিয়ে তাকে সাহেব সাজালেন। তারপর সার্কাস দেখে, চৌরঙ্গীর ধারে একটি ইংরেজী হোটেলে গিয়ে দুজনে রাত্রের আহার শেষ ক'রলেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে মোটরে চড়ে দুজনে আবার খানিকটা বেড়াতে চ'ললেন। মোটরে যেতে যেতে জরতের বাবা জরতকে নিজেদের বংশের গৌরবের কথা সব শোনাতে লাগলেন।

"জানিস্ জরৎ, আমাদের বংশ পণ্ডিতের বংশ। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। তাঁর মত ইংরেজী সে যুগে ভারতবর্ষে খুব কম লোকেই জানত'; সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি, মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট তাঁর মুখস্থ হ'য়ে গেছলো। আমার বাবার লেখা একখানা বই প'ড়ে অক্‌স্‌ফোর্ডের অধ্যাপকেরা পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন, একজন বাঙালীর কলমে এমন অপূর্ব ইংরেজী লেখা দেখে। অল্প বয়সে তিনি মারা যান, তা না হ'লে একদিন তাঁর খ্যাতিতে সারা দেশটা ভরে উঠত'। আর আমি যেবার এম্-এ পাশ ক'রলুম, সার আশুতোষ আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইলেন। আমি গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ললেন, 'তুমি যে বংশের ছেলে, তার উপযুক্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছ; বাপঠাকুর্দার নাম তুমি রাখতে পারবে।' এইটাই হ'লো সবচেয়ে বড় কথা, জরৎ। যে বংশে তুমি জন্মাবে তার সুনাম যেন বজায় রাখতে পার।...আমি তাই কেবল ভাবি, সনৎ এমন বংশছাড়া ছেলে কেমন ক'রে হ'লো। এ বংশের কারো হাত পেলেনা, পেলে কি না মামাদের হাত! তোর মামাদের মত নিরেট মূর্খ কি আর ভূভারতে আছে? খালি এস্রাজ সেতার আর পাখোয়াজ বাজিয়েই বাপের জমিদারীটা রসাতলে দিচ্ছে। তোদেরকে ত' আমি তাই জন্যে মামার বাড়ীর ত্রিসীমানায় যেতে দিই না। তবু যে কোথা থেকে মামার বাড়ীর ঐ ছোঁয়াচে রোগ সনৎটাকে পেয়ে ব'সল, কে জানে!"

নির্জনপ্রায় রাস্তা দিয়ে মোটরখানি ছুটছে, কানের পাশ দিয়ে পৌষ মাসের হিমশীতল কনকনে বাতাস হু হু ক'রে ছুটে যাচ্ছে।

বাবা ব'ললেন,—"কিরে জরৎ, শীত ক'রছে?"

জরৎ বললে,—"হাঁ।"

বাবা ড্রাইভারকে ব'ললেন,—"আর না, ফের এইবার।"

ফিরতে ফিরতে বাবা ব'ললেন,—"সনৎটা বুড়ো হ'য়েছে, এখনও ওর খোকা রোগ গেল না ; মার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও থাকবে না।"

জরৎ বললে,—"তাই ত' দাদার গায়ে মামার বাড়ীর ছোঁয়াচে রোগটা লেগে গেছে।"

জরতের কথা শুনে হো হো করে হাসতে গিয়ে বাবার বুকে খচ্‌ ক'রে কোথায় যেন লেগে গেল। বাবা গাড়ীর মধ্যে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন ; সেই সময় তাঁর মুখে যে কতখানি বেদনার ভাব ফুটে উঠেছিল, অন্ধকারে সেটা জরতের চোখে পড়ল' না।

বাড়ী পৌছে জরৎ গট্‌মট্‌ ক'রে মার ঘরে গিয়ে ঢুকল'। উদ্দেশ্য তার এই নূতন পোষাকটা দেখিয়ে দাদার মনে একটু ঈর্ষা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সনতের ঘুম ভাঙলেও, সে চোখ খুলল' না, একটু নড়ল'ও না। মায়ের কোলটি ঘেঁসে যেমন পড়েছিল, তেমনি পড়ে রইল'।

ঘরের আলো জ্বালতেই মা'র ঘুম ভেঙ্গে গেল। সামনেই জরৎকে দেখে তিনি ব'ললেন,—"ওমা, এ কেল্লার গোরা কোথা থেকে এল ?"

কেল্লার গোরা মা'র দিকে একটিবার ফিরেও তাকালে না, এক ছুটে বাবার কাছে গিয়ে পোষাক ছাড়তে লাগল' ; ও পাশের ঘর থেকে তখন মায়ের স্নেহার্দ্র কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে,—"ওরে জরৎ, শুনে যা বাবা, কেমন সাহেব সেজেছিস্‌ একবার আমায় দেখিয়ে যা…"

বাবা ব'ললেন,—"তোর মা কেন ডাকছে রে ?"

জরৎ বললে,—"না বাবা, আর আমি মা'র কাছে শুতে যাব না ; মামার বাড়ীর সেই ছোঁয়াচে রোগটা যদি আমায় লেগে যায়।"

"না, এবার থেকে রোজ রাত্রে তুই আমার কাছে শুবি। যতক্ষণ না ঘুম আসে, কত দেশ-বিদেশের খবর তোকে আমি গল্প ক'রে শোনাব'। যদি আই-সি-এসে কম্‌পিট্‌ ক'রতে হয়, এখন থেকে তোকে তৈরী ক'রে নিতে হবে।"

পোষাক ছেড়ে আলো নিবিয়ে পিতা পুত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে আরাম ক'রে শুয়ে পড়ল'। মা এসে তখন মাথার গোড়ায় দাঁড়ালেন, ব'ললেন —"কিগো, বাপ বেটায় কোথায় দিগ্বিজয় ক'রে এলে?" এ কথায় কেউ জবাব দিলে না। মা ভাবলেন, জরৎ স্কুল থেকে ফিরে এসে কত আহ্লাদ ক'রে ব'ললে,—"মা আমি ফাষ্ট´ হ'য়েছি।" সেই থেকে ওকে একবারও কাছে ডাকিনি, একবারও আদর করিনি, আহা বাছার আমার অভিমান হ'য়েছে। লেপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মা জরতের হাতদুটি চেপে ধ'রলেন, হাতদুটি ঠাণ্ডা বরফ। "ইস্ হাত-দুটো যে হিম হ'য়ে গেছে, কত ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস্ রে?" ছেলের হাত দুটো কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা ব'ললেন,—"আয় জরৎ, আমার কাছে শুবি আয়, ঘ'সে ঘ'সে তোর হাত দুটো গরম ক'রে দোবো।" জরৎ জোর করে মায়ের হাত থেকে নিজের হাত দুটি ছাড়িয়ে নিলে। রুক্ষস্বরে বাবা ব'ললেন,—"ও আর এবার থেকে তোমার কাছে শোবে না। একটা ছেলের ত' মাথা খেয়েছ, আর ওর দিকে নজর দিও না।" মায়ের অভিমানে একটা নিষ্ঠুর আঘাত লাগল'। তিনি রাগ ক'রে চলে গেলেন।

মা এ ঘরে এসে দেখেন সনতের ঘুম ভেঙে গেছে, সে বালিসে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে। মা উঠে যেতে সনতের মনে হ'ল, সকলেই জরৎ জরৎ ক'রে পাগল, আমি ফেল্ ক'রেছি ব'লে আমি সকলের কাছেই ফেলনা। এই কথা মনে হ'তেই বুকের ভেতর থেকে একটা রুদ্ধ

বেদনা তার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল' ; সে বালিসে মুখ গুঁজে চোখের জল বৃথাই রোধ ক'রবার চেষ্টা ক'রছিল। মা এসে সনতের মাথাটা দুহাতে তুলে ধ'রে যখন জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কি হয়েছে রে সনু?" তখন সনৎ আর কিছুতেই আত্মসংবরণ ক'রতে পারলে না ; তার চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল গড়াতে লাগল'।

মায়েরও চোখ দুটো শুষ্ক রইল না। "কাঁদিসনে সনু, আমি তোকে কাল একটা ভাল পোষাক কিনে দোবো। তোর বাবা তোকে নাইবা ভালবাসলে, আমি তোকে…" ব'লতে গিয়ে মা কেঁদে ফেললেন ; তাঁর আর কিছু বলা হ'ল না। সনৎকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। মায়ের বুকে মুখখানা গুঁজে সনৎ কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে প'ড়ল'। সনৎকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে মা যখন ঘুমিয়ে প'ড়লেন তখন অনেক রাত, চারিদিক্ নিস্তব্ধ। শুধু সার্সীর ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে আকাশের গুটি কতক তারা মায়ের অপরিসীম স্নেহের সাক্ষী স্বরূপ জেগে রইল'।

বড়দিনের ছুটির কটাদিনই জরৎকে নিয়ে তার বাবা, আজ সিনেমা, কাল থিয়েটার, পরশু জুলজিক্যাল্ গার্ডেন,—এই ক'রে বেড়ালেন।

যেদিন থিয়েটার যাচ্ছেন, বাবা একবার মাকে ব'ললেন,—"চল, আজ তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

মা হাসিমুখে ব'ললেন,—"সনুও যাবে ত?"

বাবা রেগে উঠে ব'ললেন,—"ও কোথা যাবে? দুবছর এক ক্লাশে ফেল্ ক'রেছে, থিয়েটারে যাবার কথা মুখে আনতে ওর লজ্জা করে না?…সন্ধ্যে বেলা মাষ্টার আসবে, ও ব'সে আঁক কষবে। গাধাটা

তাঁকে একেবারে শূন্য পেয়ে ব'সে আছে। আমি স্কুলে তাঁকে কখন একশোর কম নম্বর পাইনি, আর আমার ছেলে হ'য়ে···"

বাধা দিয়ে মা ব'ললেন,—"তবে আমারও যাওয়া হবে না। ছেলের মুখ ভার দেখে আমার কোথাও যাওয়া চলবে না।"

"কেন ছেলে তোমার ছুমাসের খোকা নাকি? মাকে একদণ্ড না দেখতে পেলে একেবারে কেঁদে দমবন্ধ হ'য়ে যাবে?"

"সত্যিই ত', সন্নু আমার আজও খোকাই আছে, ও দুদণ্ড আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।"

"ও সব ন্যাকামি। আর এই সব প্রশ্রয় দিয়েই তুমি ওর মাথাটা খাচ্ছ। তোমাকে আজ আমার সঙ্গে যেতেই হবে। তুমি বাড়ীতে না থাকলে বরং ও দুঘণ্টা মাষ্টারের কাছে মন দিয়ে পড়তে পারবে।"

মা কিন্তু কিছুতেই যেতে রাজী হ'লেন না; তাঁর সেই এক কথা সন্নুকে ফেলে তিনি কোথাও যাবেন না!

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন,—"তুমি বুঝছ না কেন? আমি ওর মনে একটা ধিক্কার জাগিয়ে তুলতে চাই; যাতে ওর চোখ খুলে যায়, যাতে ওর জীবনের ধারা পালটে যায়।"

মা শান্তভাবে ব'ললেন,—"আমি অতশত বুঝতে চাই না। আমি যাব না, মিথ্যে তুমি জোর ক'রো না।"

এমন সময় জরৎ একেবারে সাহেব সেজে বাপের সামনে এসে দাঁড়াল'; জরৎকে দেখে এক মুহূর্তে বাপের মুখের চেহারা পালটে গেল। তিনি হাসিমুখে ব'ললেন,—"রেডি? দেন্ লেট্ আস্ ষ্টার্ট্।"

এমনি করে বড়দিনের ছুটিটা কেটে গেল; দোস্‌রা জানুয়ারী স্কুল খুল্‌ল'।

সাড়ে নটার সময় দুই ভাই আর বাবা একসঙ্গে ভাত খেতে ব'সেছে ; মা সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছেন। খেতে খেতে সনৎ একবার মা'র মুখের দিকে চাইল ; মা একটুখানি হেসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"আচ্ছা, স্কুলের মাষ্টাররা ত' তোমায় বেশ খাতির করেন, না ?"

"তা করেন বৈকি, আমার কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা আছে।"

"তাই ব'লছিলুম, যদি তুমি হেড্ মাষ্টারকে একখানা চিঠি লেখ।"

"সনতের জন্যে ?" বাবার গলার স্বর একটু চড়ে উঠল'।

"এক ক্লাশে কি আর ও তিন বছর পড়বে ?" মা অতি শান্ত ও বিনীতভাবে ব'লতে লাগলেন,—"আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গেই বা কি ক'রে পড়ে, লোকেই বা কি বলবে ?"

হাসির কথা এতে কিছুই নেই, কিন্তু বাবা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ; তারপর সনতের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

খাওয়া শেষ ক'রে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে সিগ্রেটের কেস্ আর দেশলাইয়ের বাক্সটি দিতে দিতে মা আবার কথাটা পাড়লেন,—"তা হ'লে কি ব'লছ তুমি ?"

"ব'লছি যে ঐ ক্লাশে ঐ স্কুলেই ও পড়বে, যতদিন পর্য্যন্ত না নিজের জোরে প্রমোশন্ পায়।"

•

গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণতম আলোকরশ্মি দেখলে অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মনে যে কি আশার সঞ্চার হয় সে শুধু অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকই ব'লতে পারে। দুবছরের পুরাণ ক্লাশে

ঢুকতেই সনৎ যখন দেখলে তার প্রিয়তম পুরাণ বন্ধু গুরুদাস তার পুরাণ সীট্‌টিতে ব'সে মুচকে মুচকে হাসছে, তাকে দেখে তখন এক মুহূর্তে তার মনটা কেন যে একেবারে হাল্কা হ'য়ে গেল সে কেবল সেই বলতে পারে। বন্ধুবর হাত বাড়িয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা জানালে,—"বার্ডস্ অফ্ দি সেম্ ফেদার্ ফ্লক্ টুগেদার্, আয়,...এতে আর দুঃখু কি ?"

সত্যই তখন আর সনতের মনে কোনই দুঃখ ছিল না। গুরুদাসকে পাশে পেয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। আর একটা মস্ত দুর্ভাবনা তার কেটে গেল, যখন সে দেখলে তার ছোট ভাই জয়ন্তের "এ" সেক্‌সনের রোলে নাম রয়েছে, আর তার রয়েছে পুরাণ "বি" সেক্‌সনে। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়লেও এক সেক্‌সনে পড়বার বিড়ম্বনা থেকে সে আপাততঃ রেহাই পেল'।

প্রথমেই সারদা পণ্ডিত মশায়ের ক্লাশ। ক্লাশে ঢুকতেই প্রথমে তাঁর চোখ প'ড়ল' ক্লাশের তথা সমগ্র স্কুলের এই দুটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের প্রতি। জ্যোতিষ্ক দুটির ঔজ্জ্বল্যে বোধ হয় তাঁর চোখে ধাঁধা লেগে গেল; তিনি অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারলেন না, একদৃষ্টে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন। পণ্ডিত মশায়ের রকম দেখে ক্লাশে একটা হাসির মৃদু গুঞ্জন উঠল', অনেকক্ষণ পরে বড় মিষ্টস্বরে তিনি সনৎকে সম্ভাষণ ক'রলেন,—"কি বাবা সনৎকুমার, একেবারে যে মৌরসী পাট্টা গড়ে তুলেছ!...আয় উঠে আয়, একবার মহাপুরুষ দর্শন করি।" সনৎ মাথা হেঁট ক'রে এক পা এক পা ক'রে পণ্ডিত মশায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল'; বাঁ হাতে সনতের কানটা চেপে ধ'রে নাড়তে নাড়তে পণ্ডিত মশায় ব'লতে লাগলেন,—"ওরে, তোর বাবা যে দেশের একটা দিক্‌পাল! তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে সারা দেশ যে গর্ব

করে রে! তাঁর বংশে তোর মত এমন কুলাঙ্গার জন্মাল কোথা থেকে? এমন বাপের ছেলে ব'লে পরিচয় দিবি তুই কোন মুখ নিয়ে, মুখপোড়া?"

সনৎকে ছেড়ে দিয়ে এবার পণ্ডিত মশায়ের দৃষ্টি পড়ল' গুরুদাসের দিকে। "উনি আবার কে? একেবারে ঘর আলো ক'রে বসে আছেন!" তারপর পণ্ডিত মশায় সসম্ভ্রমে একটি প্রণাম ক'রে ব'ললেন,—"সার গুরুদাস না কি? কি বাবা হাইকোর্টের বিচারাসন থেকে নেমে এসে এবার কি এইখানেই অধিষ্ঠিত হ'লেন, এই অভাজনদেরকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে?"

গুরুদাস সনৎ নয়, সে চোট্‌পাট্‌ জবাব দেয়, ব'ললে—"না সার।"

"না স্যার কিরে? আয় উঠে আয়।" পণ্ডিত মশায় গর্জন ক'রে উঠলেন।

গুরুদাস কাছে আসতেই তিনি তার কানটা ধ'রে নাড়তে লাগলেন; আর তাঁর গলা দিয়ে একটা কান্নার মত স্বর বেরতে লাগল'—"ওরে তুই ঐ নামের কলঙ্ক রে, নামের কলঙ্ক। ঐ নামে তোকে ডাকলে যে মহাপাপ হয় রে, মহাপাপ হয়।"

গুরুদাস ব'ললে,—"বাবার দেওয়া নাম; তিনি বেঁচে থাকলে আমি কালই তাঁকে ব'লে এনাম বদলে ফেলতুম। কিন্তু তিনি স্বর্গে গেছেন কে আর নাম বদলে দেবে বলুন।"

এই একটি কথায় গুরুদাস পণ্ডিত মশায়কে জয় ক'রে ফেললে। কানটি ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিত মশায় অতি শান্তভাবে ব'ললেন,—"তোর বাবা নেই, নারে?"

"না", অতি বিমর্ষভাবে গুরুদাস বললে।

"তাই তোর পড়াশোনা হ'চ্ছে না। বাবা না থাকলে ছেলেদের

মানুষ হ'য়ে ওঠা যে কি কঠিন সে আমি হাড়ে হাড়ে জানিরে বাবা, হাড়ে হাড়ে জানি।" তারপর গুরুদাসের পিঠে ও মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে পণ্ডিত মশায় ব'লতে লাগলেন,—"তাই ব'লে তুই, দুঃখ করিসনি বাবা, মাথার উপর ভগবান্ আছেন; তিনিই অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখিস, তা হ'লেই তুই মানুষ হ'য়ে উঠবি।" পণ্ডিত মশায়ের গলার স্বর ক্রমে ভারী হ'য়ে উঠছিল; তিনি গুরুদাসের মাথায় হাত রেখে ব'ললেন,—"তুই দুঃখ করিসনি; স্কুলের পড়ায় তুই ফেল ক'রেছিস্, কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় তুই সফল হ'বি; এই আমি তোকে আজ আশীর্বাদ ক'রছি।...যা বাবা ব'সগে যা।"

মুখ টিপে কোন রকমে হাসি চেপে গুরুদাস সনতের পাশে গিয়ে বসে তাকে একটা চিমটি কেটে চাপা গলায় বললে,—"দেখলি?"

সনৎ তেমনি চাপা গলায় ব'ললে,—"মাইরী তোর কি বুদ্ধি!"

ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে ভাবলে,—"গুরুদার জোড়া মেলা ভার।"

দিন যায়।

সনতের কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত মনকে গুরুদাস একটা সহজ আনন্দে তাজা ক'রে তুলেছে। গুরুদাসের সঙ্গে সনৎ অনেক দিন এই স্কুলে এক সঙ্গে পড়ছে; কিন্তু এখন দুজনের একই অবস্থায় দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তম হ'য়ে উঠেছে। গুরুদা ও সনৎ, সনৎ আর গুরুদা, স্কুলে যখন যেখানেই দেখ দুটিকে ঠিক একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে। ক্লাশের 'রেগুলার' ছাত্রেরা এদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না; বুঝি ভয় হয়, পাছে তাদের গায়ে এদের ছোঁয়াচ্ লাগে। স্কুলের শিক্ষক মশায়েরা এদের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ক্লাশে পড়াবার

সময় বড় একটা এদের দিকে নজর করেন না; বড় একটা প্রশ্ন ক'রে এদের বিব্রত ক'রতে চান না। যদিবা কোন শিক্ষক এর ব্যতিক্রম করেন ত' অমনি সঙ্গে সঙ্গে এমন পিত্তি জ্বালান' উত্তর আসে যে আর প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই ব্যবধান আর অবহেলার মধ্য দিয়ে দুটি প্রাণ পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে নিজেদের চারিদিকে একটা স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলছিল।

একদিন বৈকালে ছুটির পর হেড্‌ মাষ্টার মশায় জরৎকে নিজের খাস কামরায় ডেকে পাঠিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কিরে? ব'লেছিলি?"

জরৎ ব'ললে,—"হাঁ, বাবা আজই আপনাকে দেখা ক'রতে ব'লেছেন।"

একটু মুচকে হেসে গলাটা আরও নামিয়ে হেড্‌ মাষ্টার ব'ললেন,—"কি বুঝলি তুই?"

"আমি ত' খুব ক'রে ব'লেছি। বাবা হাসতে লাগলেন।" তারপর একটু থেমে, একটু হেসে, জরৎ বললে,—"বাবা আমাকে খুব ভালবাসে সার, আমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

"বেশ বেশ; তোর মত ছাত্র থাকতে আমার আর ভাবনা কি?" তারপর জরতের মাথার উপর দুটি হাত রেখে হেড্‌ মাষ্টার মশায় ব'ললেন,—"আমি প্রাণ থেকে তোকে আশীর্বাদ করছি বাবা, তোর ভাল হ'বে।"

হেড্‌ মাষ্টার আর কালবিলম্ব না ক'রে, লালদিঘীর ট্রামে চেপে, একেবারে সনতের বাবার আফিস ঘরের প্রবেশ দ্বারে ঝোলান মোটা নীল পরদাটার সামনে এসে দম নিলেন। বাহিরে ঝকঝকে লাল

পোষাক পরা একটি চাপরাসী ব'সে আছে। চাপরাসীর হাতে নিজের নাম ও পরিচয় লেখা কাগজখানি দিতে হেড্ মাষ্টারের মন আশা ও আশঙ্কায় দুলে উঠল'।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাক প'ড়ল'। ভিতরে গিয়ে পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ভূমিকায় সনতের বাবা প্রশ্ন ক'রলেন,—"আচ্ছা হেড্ মাষ্টার মশায়, আমার সনতের কেন পড়াশোনা হচ্ছে না ব'লতে পারেন ?"

হেড্ মাষ্টার এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। আর বহুকাল মাষ্টারী ক'রে ক'রে, চর্চার অভাবে, ঠিক সময়ে একটা উপস্থিত বুদ্ধিও তাঁর মগজে জোগাল' না। তিনি বেফাঁস ব'লে ফেললেন,—"দেখুন, সনৎ ছেলেটি ত' আসলে মন্দ নয়; কিন্তু এক অসৎ সঙ্গে মিশে ও নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।"

সনতের বাবা চমকে উঠলেন,—"অসৎসঙ্গ! অসৎসঙ্গ ও পেলে কোথায় ?...বাড়ীতে ত..."

"আজ্ঞে বাড়ীতে নয়, স্কুলে..."

"স্কুলে! স্কুলে আপনার অসৎসঙ্গ আসে কোথা থেকে ?"

হেড্ মাষ্টার, মাথা চুলকোতে চুলকোতে, সনতের বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, ব'ললেন,—"দেখুন অসৎসঙ্গ ব'লতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। ওদের ক্লাশে একটি ছাত্র আছে; সেও উপরোউপরি দুবার থার্ড ক্লাশে ফেল্ ক'রেছে। সেই ছাত্রটির সঙ্গে সনতের বড় ভাব। সব সময় গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ ক'রছেই। হঠাৎ দেখলেই মনে হবে যেন দুটোতে মিলে কি এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ক'রছে।"

সরকারী শাসন-বিভাগের এক ধুরন্ধর নিজের চেয়ারে ব'সে যখন

শুনলেন, যে তাঁরি ছেলে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তখন তাঁর যে মূর্তি হ'ল, সেটা হেড্ মাষ্টারের কাছে মোটেই আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল না।

সনতের বাবা গর্জন ক'রে উঠলেন,—"ষড়যন্ত্র? ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আপনি ব'ললেন না? আপনার স্কুলে ব'সে আপনারি ছাত্রেরা ক'রছে; আর আপনি নির্বিকার, সম্পূর্ণ নির্বিকার হ'য়ে ব'সে দেখছেন। বাঃ! চমৎকার আপনার শিক্ষা-ব্যবস্থা! আর চমৎকার আপনার স্কুল!"

হেড্ মাষ্টার একগা ঘেমে উঠলেন, ব'ললেন,—"আজ্ঞে ষড়যন্ত্র ব'লতে আপনি যা' বুঝছেন, তা' নয়। সে সব কিছু নয়। আমি ব'লছিলুম···।"

"সে ছেলেটির নাম কি?" সনতের বাবা এইবার আমলাতান্ত্রিক স্বর ধ'রলেন।

"গুরুদাস।"

"পুরো নাম জানেন না? ঠিকানাও বোধ হয় স্মরণ রাখা সম্ভব নয়?"

ঠিকানা স্মরণ রাখা সম্ভব না হ'লেও গুরুদাসের পুরোনাম হেড্ মাষ্টারের হাড়ে হাড়ে গাঁথা আছে। কিন্তু সে দুরন্ত হ'লেও ত' তাঁরই স্কুলের ছাত্র। কি জানি কি এক অজানা আশঙ্কায় ও সন্দেহে তিনি পুরোনাম ব'লতে সাহস ক'রলেন না। কেবল তিনি আমতা আমতা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন,—"প্রায় সাতশো ছাত্র পড়ে আমাদের স্কুলে।"

"হুঁ। থার্ড ক্লাশে কটি সেক্‌সন্ আছে আপনাদের?"

"দুটি, এ, বি।"

"জরৎ কোন সেক্‌সনে পড়ে?"

"এ তে।"

"আর সনৎ ?"

"বি তে।"

"আর সেই গুরুদাস ছেলেটি ?"

"সেও বি তে। আমি অনেক দিন থেকে লক্ষ্য ক'রছি···"

"অথচ প্রতিকারের চেষ্টা আপনি কিছুই করেন নি।"

কাল থেকেই নিজের হাতে এর প্রতিকার ক'রবেন, তার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং সেই আমলাতান্ত্রিক বাঙালী সাহেবটির রুষ্ট মেজাজ তুষ্ট ক'রতে যতদূর সম্ভব মোলায়েম ভাষা কয়েকটি উপহার দিয়ে হেড্ মাষ্টার হতাশচিত্তে বাড়ী ফিরলেন। যে কাজের জন্যে গেছলেন তার দফা গয়া হ'য়ে গেল, আর তার দরুণ যত কিছু রাগ গিয়ে পড়ল' বেচারী গুরুদাসের উপর।

পরের দিন স্কুলে এসে সনৎ গুরুদাসকে ব'ললে,—"দেখ ভাই, আজ সকালে বাবা তোর নাম, তোর মামার নাম, তোদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞেস ক'রছিলেন। কেন বল ত ?"

এই কথা শুনে গুরুদাস ত' ভারী খুসী ; সনতের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে,—"তবে বোধ হয়, তোর বাবা আমাকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবে।"

তাই ত' ; এই সহজ কথাটা আর এতক্ষণ সনতের মাথায় আসছিল না ; সে শুধু শুধু ভেবেই আকুল হ'চ্ছিল।

গুরুদাসের কাঁধের উপর মাথাটি রেখে সনৎ আস্তে আস্তে ব'লতে লাগল',—"তা হ'লে বেশ হয়, না রে ? তোকে আমার মা'র সঙ্গে চেনা করিয়ে দেব'। আমার মা তোকে একবার চিনতে পারলে আর

কিছুতেই ভুলতে পারবেন না; তখন ফি রবিবারে আর ছুটির দিনে তোকে নিমন্ত্রণ ক'রবেন। ছুটির দিনে তোকে দেখতে পাইনা ব'লে আমার বড্ড মন কেমন করে। এবার থেকে, ছুটির দিনেও তোকে কাছে পাব। সে বেশ হবে, না রে?"

"আর, যদি আমি কোনদিন স্কুল কামাই করি?" দুষ্টামির হাসি হেসে গুরুদাস জিজ্ঞেস ক'রলে।

"ক্লাশে তোকে দেখতে না পেয়ে, একলা আমি, জল থেকে তোলা কৈ মাছের মত, ছট্‌ফট্‌ ক'রতে থাকব'। কিন্তু তুইত' আর স্কুল কামাই করিস না; এই যা রক্ষে।"

"আজ কিন্তু বড় জোর আমি কামাইয়ের হাত থেকে বেঁচেছি।"

"সে কিরে? কেন?"

"আর বলিস্‌ কেন? মায়ের যত তীর্থ-ধর্ম আমার এই স্কুলের দিনে। কালরাত্রে মা এক অলক্ষণে স্বপ্ন দেখে, আজ সকাল থেকে জেদ ধ'রেছে, কিছুতেই আমাকে আজ স্কুল আসতে দেবে না।"

অবাক হ'য়ে সনৎ বললে,—"কেন রে?"

"আমার কি এক ফাঁড়া আছে, তাই কাটাতে আজ তারকেশ্বরে যেতে হবে। সে কি জেদাজেদি আর চোখের জল ফেলা! আমি খুব ধমকে উঠলুম,...ছেলের স্কুল কামাই করিয়ে পড়াশোনা মাটি না করালে বুঝি তোমার ধর্ম কর্ম হয় না? কেন ছুটির দিনে এই সব ব'লতে পার না?"

এই কথায় সনৎ হি হি ক'রে হেসে উঠল'।

গুরুদাস ভ্রুকুটি ক'রে ব'ললে,—"হাসিস্‌ যে?"

"আহা বাছার আমার পড়াশোনায় ত' আর ধ'রছে না, তাই বছরে বছরে অ্যানুয়ালে..."

তাকে বাধা দিয়ে গুরুদাস ব'ললে,—"তুই থাম সনৎ, তোর যে কবে বুদ্ধি হবে, আমি শুধু তাই ভাবি! মা কি আমার জানে যে আমি বছরে বছরে ফেল্ করছি? মা জানছে যে তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে ঠিক বছরে বছরে লাফাতে লাফাতে ক্লাশে উঠে যাচ্ছে।"

"বলিস কি?" সনৎ ব'লে উঠল'।

গুরুদাস মুরুব্বিয়ানা ঢঙে বলতে লাগল',—"ফি বছর রেগুলার অ্যাটেন্ড্যান্সের যে প্রাইজখানা পাই, সেখানা মার হাতে দিয়ে বলি, এই দেখ মা তোমার ছেলে ফার্ষ্ট প্রাইজ নিয়ে এল'। মা অমনি সওয়া পাঁচ আনার হরির লুঠ এনে ঠাকুর ঘরের দরজায় ছড়িয়ে দিয়ে ঢক্‌ঢক্ ক'রে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কত দেবতার নামে কত কি যে মানত করেন বাপমরা এই ছেলেটির জন্যে, দেখে হেসে আর আমি বাঁচি না।"

সনৎ অবাক্ হ'য়ে গুরুদাসের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল', তারপর ব'ললে,—"আচ্ছা, প্রগ্রেশ্ রিপোর্ট যখন তুই সই করাতে যাস্, তখন?"

গুরুদাস হাত উলটে বললে,—"আরে, মামা ত' আমার গার্জেন; তিনি মুদীর দোকান চালান, ইংরেজীতে একেবারে ঘণ্টা। প্রগ্রেস্ রিপোর্টখানা তাঁকে দেখিয়ে বলি, 'মামা, আমি ফার্ষ্ট হ'য়েছি, এই দেখ নম্বরের কাগজ; এইখানে একটা সই ক'রে দাও।' অমনি তিনি একমুখ হেসে বাংলায় একটা সই টেনে দেন।" তারপর সনতের পিঠ চাপড়ে গুরুদাস ব'ললে,—"সনৎ এখনও অনেকদিন আমার সাকরেতী করতে হবে, যদি মানুষ হতে চাস।"

"তোর সাকরেতী করান' আমি বের করছি, শূয়োর।" অচমকা দুজনের মাঝখানে প'ড়ে হেড্ মাষ্টার ঘাড় ধ'রে গুরুদাসকে হলের দিকে

নিয়ে চ'ললেন, আর যাবার সময় সনতের দিকে চেয়ে ব'লে গেলেন,—"সনৎ, আজ থেকে তুই 'এ' সেক্‌সনে বসবি ; যা বই নিয়ে 'এ' সেক্‌সনে ব'সগে।"

গুরুদাসকে নিয়ে হেড্‌ মাষ্টার ত' চলে গেলেন ; সনতের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল'। 'এ' সেক্‌সনে ! জরতের সঙ্গে !! ভাবতেই তার বুকটা হিম হ'য়ে গেল ; কিন্তু কি করে—উপায় নেই, হেড্‌ মাষ্টারের হুকুম। শেষে অনেক ভেবে, অনেক ইতস্ততঃ ক'রে, অনেক বার মাথা চুলকে, সনৎ যখন 'এ' সেক্‌সনে গিয়ে পৌছল' তখন সারদা পণ্ডিত মশায় সেখানে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

সনৎ যেতেই বিনা ভূমিকায় পণ্ডিত মশায় তাকে প্রশ্ন ক'রলেন,—"এই, 'অন্য' শব্দ চতুর্থীর একবচনে কি হয় ?"

বেচারী সনৎ তখনও দম নেবার ফুরসৎ পায়নি, হাঁপাতে হাঁপাতে পণ্ডিত মশায়ের দিকে চেয়ে পাঁচবার "অন্য শব্দ ? অন্য শব্দ চতুর্থীর একবচনে ?" ক'রলে ; পাঁচবার কড়িকাঠের দিকে চাইলে ; দশবার কুঁতিয়ে নিলে ; তারপর একগা ঘেমে, অনেক হিসাব নিকাশ ক'রে ব'ললে,—"অন্যায়"।

বাস্‌ আর যায় কোথা, পণ্ডিত মশায় রুখে উঠলেন,—"অন্যায় ! শুধু একবার অন্যায় ! তোমাকে কোন প্রশ্ন করা আমার একশোবার অন্যায়।"

তারপর জরতের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"জরৎ ?"

জরৎ টপ্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে,—"অন্যস্মৈ।"

"দে, দে দাদার কান মলে।"

জরৎ মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল' ; সনতের বুকের মধ্যে ঝড় উঠল'।

পণ্ডিত মশায় আরও দু তিনবার আদেশ ক'রলেন, জরৎ কিন্তু মাথা তুলে চাইতেও পারল' না।

তখন পণ্ডিত মশায় ব'ললেন,—"গুরুর কথা অবহেলা ক'রলে কি হয় জানিস্, জরৎ?"

জরৎকে এবার চোখ তুলে চাইতে হ'ল।

পণ্ডিত মশায় ব'ললেন,—"সব বিদ্যে পণ্ড হ'য়ে যায়। আজ এক-দিনেই দেখবি যে আজ পর্য্যন্ত তুই যা শিখেছিস সব ভুলে গেছিস।"

সর্বনাশ! জরতের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। সে অভিভূতের মত এক পা এক পা ক'রে আগিয়ে দাদার কান দুটো ধ'রে মলে দিলে।

সনৎ চোখ বুজল'; ছোট ভায়ের প্রতি চেয়ে দেখবার প্রবৃত্তি বা সাহস দুইই তখন সে হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদের শব্দে সকলের দৃষ্টি হলের দিকে প'ড়ল'। এ গুরুদাসের গলা। সনৎ চমকে উঠল'। নিজের অবস্থা ভুলে গেল; পণ্ডিত মশায়ের শাসন ভুলে গেল; ব্যাকুলভাবে সে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে হলে গিয়ে দাঁড়াল'। হলের মাঝখানে তখন হেড্ মাষ্টার একটা লম্বা লিক্‌লিকে বেত দিয়ে গুরুদাসকে মেরে যাচ্ছেন।

হেড্ মাষ্টারের হাতে গুরুদাসের এই ধরণের শাস্তি আজ নূতন নয়। কিন্তু হেড্ মাষ্টারকে এমন মরিয়া হ'য়ে উঠতে আর কেউ কখন দেখেনি; আর হাজার মার খেয়েও গুরুদাসকে কেউ কখন এমন আকুল-ভাবে আর্তনাদ ক'রতে শোনেনি।

হেড্ মাষ্টারের হাতের বেত যেন আর থামতেই চায় না; সপাৎ সপাৎ ক'রে গুরুদাসের পিঠে, কোমরে, পায়ে অবিরাম আঘাত ক'রেই যাচ্ছে। গুরুদাস যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে আর ব'লছে,—"আপনার দুটি

পায়ে পড়ি, এই বারের মত রেহাই দিন।···আমি আর কখন সনতের সঙ্গে মিশব না, তার সঙ্গে কথা কইব না···সে যে দিকে থাকবে সে দিক মাড়াব না। আমি নিজে গোল্লায় গেছি, একাই যাব আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব না।” ব’লতে ব’লতে ছট্‌ফট্‌ ক’রতে ক’রতে গুরুদাস সেইখানে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল’।

পণ্ডিত মশায় ক্লাশে ব’সে আর সে দৃশ্য দেখতে পারলেন না, ছুটে গিয়ে হেড্‌ মাষ্টারের হাতদুটো ধ’রে ব’ললেন,—“খুব হ’য়েছে, এইবার রেহাই দিন। আহা বাপমরা ছেলে।”

বাধা পেয়ে হেড্‌ মাষ্টারের একটু হুঁস হ’ল, কিন্তু রাগ থামল’ না। সকোপে হাতের বেতখানি গুরুদাসের উপর ছুঁড়ে দিয়ে হেড্‌ মাষ্টার ব’ললেন,—“বাপমরা ছেলের গুণ ত’ কম নয়। কত কষ্টে মশায় ছেলের একটি সরকারী চাকরী জোগাড় ক’রছিলুম···।” ব’লতে গিয়ে হেড্‌ মাষ্টার থেমে গিয়ে সেখান থেকে চ’লে গেলেন; কারণ কথাটা, বোধ হয়, গোপনীয়, রাগের মাথায় বেফাঁস তিনি ব’লে ফেলেছিলেন। পণ্ডিত মশায় গুরুদাসের হাতটি ধ’রে নিয়ে গিয়ে তার ক্লাশে বসিয়ে দিয়ে এলেন।

সেইদিন সারাদিনটা সে ক্লাশে মুখ গুঁজে সেই যে একভাবে ব’সে রইল’, কেউ আর তার মুখ তোলাতে পারল’ না। ক্লাশের দুএকজন ছাত্র এসেছিল তাকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু গুরুদাস এমনভাবে তাদেরকে ঠেলে দিয়েছিল যে তারা ছিটকে পড়তে পড়তে কোন রকমে বেঁচে গেছল’। ছুটির পর যখন একে একে ক্লাশের সব ছেলে চলে গেল তখনও গুরুদাস ঠিক সেইভাবে বসে রইল’।

বাড়ী যাবার সময় পণ্ডিত মশায়ের সেদিকে নজর পড়ল’। তিনি ঘরে ঢুকে গুরুদাসের পিঠের উপর হাত রেখে বড় সদয় কণ্ঠে

ডাকলেন,—'গুরুদাস'। গুরুদাস সাড়া দিল' না, মনে হ'ল সে তখনও কাঁদছে। পণ্ডিত মশায় তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললেন, —"বাড়ী যাবিনি বাবা ?"

গুরুদাস ফোঁস ক'রে উঠে দাঁড়াল', ব'ললে,—"যাচ্ছি পণ্ডিত মশায়, আজই আমার শেষ যাওয়া।"

তার চোখ দুটো লাল, গাল দুটো তখনও চোখের জলে ভিজে র'য়েছে।

পণ্ডিত মশায় তার মাথার ওপর হাতটি রেখে ব'ললেন,—"কার উপর রাগ ক'রেছিস বাবা ? উনি যে তোর গুরু, তোর শিক্ষাগুরু, ওঁর হাতের মার যে তোর পরম আশীর্বাদ ; তোর যে সব পাপ ধুয়ে মুছে গেল। দেখ দেখিনি কত কেঁদেছিস! এমনিভাবে প্রাণখুলে কাঁদতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা! আজ তোর মনের সমস্ত মলিনতা চোখের জলে যে ভেসে গেল বাবা।"

অতি শান্তস্বরে গুরুদাস বললে,—"মারের জন্যে ত' কাঁদিনি আমি ; আমি কাঁদছি, আপনাদের চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে। এই স্কুলে কতদিন পড়লুম, আমি কাঁদছি এর মায়ায়।" ব'লে পণ্ডিত মশায়কে আর দ্বিরুক্তি করবার অবসর না দিয়ে গুরুদাস ঝড়ের মত স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে চাদরের খুঁটে চোখ মুছে পণ্ডিত মশায় মনে মনে বলতে লাগলেন,—"দুরন্ত ছেলেগুলো এত মায়াবীও হয়, একেবারে চোখ দিয়ে জল বের ক'রে তবে ছাড়ে।"

চলন্ত দোতলা বাসের একটা কোণে ব'সে হেড্ মাষ্টার ঠিক সেই সময় ভাবছিলেন যে, এ বৎসর প্রাইজের সময় তিনি একটা নূতনত্বের

সৃষ্টি ক'রবেন ; তিনি নিজের খরচে একখানি সোনার মেডেল দেবেন। যে ছেলে একাদিক্রমে সাত বৎসর তাঁর স্কুলে পড়বে এবং সেই সাত বৎসরের মধ্যে একদিনও কামাই ক'রবে না, সেই পাবে এই সোনার মেডেলখানি। এই গৌরবের প্রথম অধিকারী হবে গুরুদাস। তারপর স্কুলের ইতিহাসে এ গৌরব আর কেউ কখন পাবে কি না কে জানে, কিন্তু হেড্ মাষ্টারের আশীর্বাদভরা এই পদকখানি যখন গুরুদাসের গলায় প্রথম ঝুলবে, তখন শুধু গুরুদাস নয় সমস্ত স্কুল তাদের এই হেড্ মাষ্টারটিকে চিনতে পারবে।

সেইদিন বৈকালে।

তখনও সনতের গৃহশিক্ষক আসেন নি, সনৎ একা পড়বার ঘরে ব'সে আছে। সামনে বইয়ের পাতা খোলা, কিন্তু তার দৃষ্টি চলে গেছে খোলা জানলা দিয়ে বাহিরের আকাশে ; আকাশে তখন কয়েকখানা ঘুড়ি উড়ছে। গুরুদাস ঘুড়ি উড়াতে বড় ভালবাসে। সনতের মনে হ'ল আজ আর সে ঘুড়ি উড়াতে পারবে না ; আজ আর হয়ত' সে ছাদেও উঠতে পারবে না। হয়ত' সে এখন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ ক'রছে, হয়ত' তার গায়ে মারের দাগ সব ফুটে উঠেছে। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সনতের মনে হ'ল, যেন সারা আকাশময় এখনও গুরুদাসের আর্তনাদ ভেসে বেড়াচ্ছে। গুরুদাসের কথা ভাবতে ভাবতে সনৎ এতই তন্ময় হ'য়ে গেল যে, তার মা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তা সে বুঝতেই পারে নি।

মা সচরাচর ছেলেদের পড়বার ঘরে যান না ; ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে তিনি বড় একটা মাথা ঘামান না। কিন্তু

আজ সকালে সনতের বাবার মুখে তিনি যে কয়েকটি কথা শুনলেন তাতে সনতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরও একটু সন্দেহ জেগেছে। তাই মাষ্টার আসবার আগে তিনি চুপি চুপি দেখতে এসেছেন, সনৎ পড়বার ঘরে সত্যিই পড়ে, না অন্য কিছু করে।

মা যখন দেখলেন, সনতের বইয়ের পাতা খোলা কিন্তু সনৎ আকাশের ঘুড়ির দিকে চেয়ে আছে, তখন আর থাকতে পারলেন না, পিছন থেকে তার কান দুটি শক্ত ক'রে চেপে ধ'রলেন; হয়ত' কিছু ব'লতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সনৎ লাফিয়ে উঠে, একবার চোখ চেয়ে ভাল ক'রে না দেখেই, সামনের বইখানাকে ছুঁড়ে দিলে মা'র দিকে। সনৎ ভেবেছিল, বাবা বাড়ী ফিরতেই জরৎ তাঁকে আজকের সব ঘটনা ব'লেছে এবং বাবার আদেশ মত সে আবার এসেছে তার কান মলতে; কথাটা মাথায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাগে এমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, চোখের দৃষ্টিও যেন তার অন্ধ হ'য়ে গেছল'। হাতের বইখানা প্রায় অন্ধ ভাবেই ছুঁড়ে মারতেই তার চোখ পড়ল' যে যাকে লক্ষ্য ক'রে সে মারলে সে জরৎ নয়, মা। সনৎ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব'সে পড়ল'। কি ব'লে যে মাকে বোঝাবে তা ঠিক করবার আগেই মা ছুটে এসে তার ঘাড়টা ধ'রে, নিজের দুর্বল দেহে যতটুকু শক্তি আছে সবটা খরচ ক'রে, সনতের পিঠের উপর ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে, ছেলের দিকে আর ফিরেও না চেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে চলে গেলেন। দুঃখে ক্ষোভে বিহ্বলতায় সনৎ যদি অন্ধ না হ'ত ত' সে দেখতে পেত' যে মায়ের চোখের কোল দুটো জলে ভ'রে গেছে। কিন্তু সনতের চোখে তখন জল ছিল না। অতি শৈশবে সে যে শেষ কবে মায়ের হাতে মার খেয়েছিল সে কথা আজ আর তার একটুও মনে নেই। জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত সে শুধু মায়ের একটি মূর্তিই দেখে

আসছে ; মায়ের অপরিসীম স্নেহ যে কতভাবে তাকে ঘিরে রেখেছে সে কথা সনতের মনে স্তরে স্তরে গাঁথা হ'য়ে আছে।

আজ প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

সেই দিন রাত্রে মা আর সনৎকে কাছে শুতে ডাকলেন না ; সে যে সারারাত কোথায় শুয়ে রইল' তার খোঁজও নিলেন না।

পরের দিন যথাসময়ে বাবা, সনৎ ও জরৎকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে, নিজে অফিসে চ'লে গেলেন। জরৎ হন্‌হন্‌ ক'রে নিজের ক্লাশের দিকে চ'লে গেল। সনৎ বহুদিনের অভ্যাস মত এক পা এক পা ক'রে 'বি' সেক্‌সনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে প'ড়ল' যে আজ থেকে তাকে 'এ' সেক্‌সনে ব'সতে হবে ; অমনি তার গতি একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল' ছোট ভাইয়ের হাতে সেই কান-মলা খাওয়ার দৃশ্য ; আর তার ক্লাশের দিকে যাওয়া হ'ল না। বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মনটা ভরে গেল। ক্লাশে না গিয়ে সে যে আর কি ক'রতে পারত', ভগবান্‌ জানেন। এমন সময় গুরুদাসের আবির্ভাব তাকে একটা কঠিন সমস্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে।

স্কুলের বিপরীত দিকের ফুটপাথ থেকে গুরুদাস ডাকলে,—"সনৎ, চলে আয়।"

গুরুদাসের গলা শুনে সনৎ যেন অকূলে কূল পেলে ; কিন্তু তবুও সে গুরুদাসের ডাক শুনেই ছুটে যেতে পারলে না। কালকের ঘটনাবলী তার আর গুরুদাসের মাঝখানে যে পাঁচিল গেঁথে দিয়েছে, তা প্রথম মুখে সনতের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য ব'লে মনে হ'ল।

সনতের দ্বিধা দেখে গুরুদাসের কণ্ঠ আরো একটু তীব্র হ'য়ে উঠল' ; সে আবার ডাকলে,—"আয় না।"

গুরুদাসের পেটে বিদ্যে না থাক তার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট জোর ছিল। এক একটা লোককে দেখা যায়, তা সে বড় লোকের ঘরেই কি আর গরিবের ঘরেই কি, যাদের গলার স্বর শুনলেই মনে হয় যেন তারা হুকুম ক'রতেই জন্মেছে। শক্তি থাক বা না থ . তাদের গলার স্বরটাই যে কত লোকের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে, কে তার হিসাব রাখে। গুরুদাস সেই জাতের ছেলে।

সনতের দ্বিধা-সঙ্কোচ সব চূরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল গুরুদাসের একটি ডাকে। স্কুল ক্লাশ হেড্ মাষ্টারের শাসন পিতার ক্রোধ ও মায়ের আশা—সব একদিকে প'ড়ে রইল; সে আর এদিক্ ওদিক্ না চেয়ে ছুটে রাস্তাটা পার হ'য়ে গুরুদাসের পাশে এসে দাঁড়াল'। গুরুদাসও বিনা বাক্যব্যয়ে একটা চলন্ত বাস থামিয়ে সনতের হাত ধ'রে উঠে প'ড়ল'।

তারপর কয়েকটি ঘটনা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত দ্রুততালে একটার পর একটা ঘটে গেল যে, সনৎ একবার ফুরসৎও পেলে না গুরুদাসকে জিজ্ঞেস ক'রতে যে এসব কি হ'চ্ছে, তারা কোথায় যাবার আয়োজন ক'রছে।

সন্ধ্যার পর শিয়ালদ ষ্টেশন ছেড়ে তাদের ট্রেনখানি যখন অনেক দূর আগিয়ে গেল, তখন সনৎ চুপি চুপি গুরুদাসকে জিজ্ঞেস ক'রলে,—"ভাই আমারা কোথায় যাচ্ছি ?"

গুরুদাস ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে—"আসাম।"

ভয়ে সনতের বুকটা দুরদুর ক'রে কেঁপে উঠল'। একটুখানি থেমে সে আবার বললে,—"সেখানে আমরা যাচ্ছি কেন ?"

সনতের গলা শুকিয়ে গেছে, গলার স্বর যেন আর বেরুচ্ছে না; কিন্তু গুরুদাসের ভয় ডর নেই, সে সহজ ভাবে জবাব দিলে,—"চাকরী ক'রতে।" তারপর একটুখানি হেসে আরও একটু গলা নামিয়ে

গুরুদাস বললে,—"ঐ যে ভুঁড়িদার মাড়ওয়াড়ী বাবুটি ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছেন, উনিই ত' আমাদের চাকরী ক'রে দেবেন। উনি খুব ভাল লোক, জানিস সনৎ; আমাদের রেল্‌ভাড়া-টেল্‌ভাড়া সব ত' উনিই দিয়েছেন রে।"

সনৎ খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বললে,—"আসাম কোথায় রে?"

গুরুদাস বললে,—"ওমা, তাও জানিসনে! পড়াশুনা ছেড়ে চলে এলি ব'লে এরি মধ্যে সব হজম ক'রে বসে আছিস? ভূগোলে প'ড়েছিস মনে নেই, আসামের রাজধানী কেপ্‌টাউন্‌।" বলেই সে মুখটিপে হাসতে লাগল'।

খানিকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে, সনৎ ঘাড় নেড়ে বললে,—"হাঁ, এইবার মনে পড়েছে।"

সনতের কাঁধের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে গুরুদাস বললে,—"সনৎ, চাকরী ক'রে এককাঁড়ি টাকা নিয়ে আমরা যখন বাড়ী ফিরব, তখন দেখিস আমাদের খাতিরের বহরটা। এই ফেল্‌করা দুটি ছেলে তখন সংসারের সকলের চোখে তাক্‌ লাগিয়ে দেবে। আমি ত' একখানা মোটর গাড়ী কিনে কিছুদিন ধ'রে আমাদের স্কুলের চারিদিকে ঘোরাব, আর হেড্‌ মাষ্টারের ঘরের সামনে হর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁর কানে তালা ধরিয়ে দেব।"

এত বড় বড় সব আশার কথা, সনতের মনের মধ্যে কিন্তু কিছুই যাচ্ছিল না। তার মনে তখন যত রাজ্যের ভয় একটার পর একটা জেগে উঠে তাকে অস্থির ক'রে তুলছিল।

গুরুদাসের মনে কিন্তু খুসীর অন্ত নেই; একটা মুক্তির নেশা আজ তাকে পেয়ে বসেছে। সে ক্রমাগত ব'কেই যেতে লাগল',—

"জানিস্ সনৎ, মাড়োয়ারী বাবুটি কি কিছুতে তোকে নিতে চান, বলেন, বাপের নাম কি, বাড়ী কোথায়, সব জানা নেই। আমি ব'ললুম ও ত', আমার মামাত ভাই। সেই শুনে তবে নিয়ে যেতে রাজী হ'লেন। তোর বাবার নাম শুনলে কি কিছুতে রাজী হ'তেন?"

সনৎ মন দিয়ে কিছুই শুনছিল না, না বুঝে না শুনে সে শুধু বললে,—"হুঁ"।

গুরুদাস ব'কেই যেতে লাগল',—"কাল স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে আর মন গেল না; ভাবলুম যে দিকে ছুচোখ যায় চলে যাব। ঘুরতে ঘুরতে বাগবাজারের ঘাটে এসে প'ড়লুম। ঘাটের উপর গঙ্গার ধরে ব'সে কত কি মনে হ'তে লাগল'। মাঝ-গঙ্গা দিয়ে কত ষ্টীমার, কত নৌকা চলে যাচ্ছে; ভাবলুম যাই সাঁতার কেটে একটা ষ্টীমারে উঠে এক কোণে লুকিয়ে থাকি। তারপর যে দেশে গিয়ে ষ্টীমার থামবে সেখানে গিয়ে নেমে প'ড়ব। ফেল-করা-ছেলেদের নিজেদের দেশে কোন ঠাঁই নেই; কিন্তু বিদেশে গেলে তাদেরকে একেবারে লুফে নেয়।" তারপর সনৎকে মৃদু একটু ধাক্কা দিয়ে বললে,—"লর্ড ক্লাইবের গল্প পড়িস্ নি?"

সনতের মনে কিন্তু কোন উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না; সে হাঁ না, কিছুই না ব'লে, বাহিরের দিকে চেয়ে রইল'।

গুরুদাসের কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই. সে ক্রমাগত বকেই যেতে লাগল',—"একটা বড় ষ্টীমার দেখে আমি জামাজুতো খুলে মালকোঁচা মেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সাঁতরে যেতে যেতে ষ্টীমারটা অনেকখানি আগিয়ে গেল, আমি আর ধরতে পারলুম না। সেই সময় আমার পা দুটোতে এমন খিল ধ'রে গেছলো যে আর সাঁতার টানতে পারছিলুম না; আর একটু হ'লে ডুবেই যেতুম, এমন সময় একখানা নৌকো

এসে আমায় তুলে নিলে। সেই নৌকোয় ছিলেন ঐ মাড়োয়ারী বাবুটি। তারপর কত ব'লে ক'য়ে ওঁকে রাজী করালুম। কালই ত' আমরা চলে যাচ্ছিলুম, খালি তোর জন্যে যাওয়া হ'ল না। ভাবলুম, আমি যদি চলে যাই তোর দশা কি হবে? আমি চাকরী ক'রে বড়লোক হব', আর তুই কি চিরজীবনটা ব'সে ব'সে খালি মাষ্টারদের কাছে খিচুনী খাবি; তা হবে না। আর তোকে ছেড়ে একা আমার বড়লোক হ'য়েই বা কি লাভ, বল না?"

জবাবের প্রত্যাশায় গুরুদাস সনতের মুখখানি দুহাতে দিয়ে ধ'রে নিজের দিকে ফেরালে, ফিরিয়েই বললে,—"একি সনু, তুই কাঁদছিস্? কাঁদছিস্ কেন রে? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?"

সনতের চোখ দুটি জলে টস্‌টস্ ক'রছিল, গুরুদাসের কথায় ঝরঝর ক'রে জল গালদুটি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল'।

গুরুদাস সনতের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে আস্তে আস্তে অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বললে,—"কি হয়েছে, আমায় বলবিনি ভাই?"

সনৎ কাঁদতে কাঁদতে বললে,—"মার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে।"

গুরুদাস সান্ত্বনার স্বরে বললে,—"ধেৎ, এর জন্যে বুঝি আবার কচি ছেলের মত কাঁদতে আছে? সেখানে গেলে সব পাওয়া যাবে, একটা মা কি আর পাওয়া যাবে না? যাকে হ'ক একজনকে মা পাতিয়ে ফেলব'। তখন আমাদের দুজনের একজন মা হবে; সেই বেশ হবে, না রে? আর কি জানিস সনু, 'মা' ডাকটাই বড় মিষ্টি, ঐ নামে যাকে ডাকবি, তারই কাছ থেকে আদর পাবি, যত্ন পাবি, ভালবাসা পাবি।" তারপর একটু থেমে একটা নিশ্বাস ফেলে, একটু

ভারী গলায় বললে,—"আসবার সময় মা'র জন্যে আমারও কি কম মন কেমন ক'রেছিল, আমি ত' ঐ ব'লে মনকে বুঝিয়েছি।"

জানলার বাহিরে তখন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ী হু হু শব্দে ছুটে চলেছে এই দুইটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কিশোর বন্ধুকে নিয়ে আরও যে কত গভীরতর অন্ধকারের বুকে তার আভাসমাত্র গুরুদাস বা সনৎ কারো মনে তখন জাগছিল না। সনৎ ভাবছিল অতীতের কথা, আর গুরুদাস তাকে শোনাচ্ছিল ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা। গুরুদাসের মুখে সেই সব সুখের ও গৌরবের কল্পনারাজি শুনতে শুনতে সনৎ তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল'। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে মাকে স্বপ্ন দেখতে লাগল'।

ঠিক সেই সময় ক'লকাতার বেতার-কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হ'চ্ছিল, সনতের আকার, অবয়ব ও বেশভূষার যতটা সম্ভব নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে তার নিরুদ্দেশের কথা, আর তার সন্ধান নিকটবর্তী কোন পুলিশ ষ্টেশনে বা কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে দেবার জন্যে অনুরোধ। সনতের মা বেতার-যন্ত্রটির সামনে বসে সেই ঘোষণা শুনছিলেন কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল নিস্পন্দভাবে।

পাশের ঘরে সনতের বাবা কাকে টেলিফোন ক'রছিলেন; বেতারের ঘোষণা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি এ ঘরে এলেন; ঘোষণাটি আগাগোড়া শুনে তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—"হ'লো ত, এবার তোমার গুণধর ছেলের মনের বাসনা কড়ায় গণ্ডায় পূর্ণ হ'লো ত? দেশ শুদ্ধ লোক ত শুনলে? আমার সুনাম, আমার বংশের সুনাম এক কুলাঙ্গারের কীর্তিতে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল ত'?"

মা'র দিক্ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না; তিনি তেমনি

নীরব নিশ্চল হ'য়ে বসেছিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে দিয়ে যে ঝড় বহে যাচ্ছিল, বাহিরে তার কোন প্রকাশ ছিল না। সনতের বাবা যদি চোখের ভাষা পড়তে জানতেন ত' দেখতে পেতেন, তাঁর নিষ্পলক চোখ দুটির মধ্যে মাতৃহৃদয়ের কতখানি বেদনা ফুটে উঠেছে।

সেদিকে লক্ষ্য করবার সময় বা প্রবৃত্তি কিছুই আর তখন সনতের বাবার ছিল না; তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মত কেবল ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে লাগলেন। তাঁর অঙ্গে তখনও আফিসের পোষাক।

আফিস থেকে ফিরে যেমন তিনি শুনলেন, সনৎ তখনও বাড়ী ফেরেনি, স্কুলে পৌঁছেই কোথায় যে সে পালিয়ে গেছে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি তিনি গাড়ী নিয়ে আবার বেরিয়ে প'ড়লেন! তারপর সমস্ত সন্ধ্যেটা থানা হাসপাতাল আর যেখানে যেখানে তাকে পাওয়া যেতে পারে, সব তন্ন তন্ন ক'রে বাড়ী ফিরে দেখেন যে, দুজন পুলিস কনস্‌টেবল্‌ তাঁর হুকুম মত গুরুদাসের মামাকে দোকান থেকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এসেছে।

গুরুদাসের মামাকে দেখে সনতের বাবা যে ভাবে তাকে সম্ভাষণ ক'রলেন, তাতে প্রথম মুখেই সেই শান্ত গোবেচারী লোকটি ত' ভয়ে থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর সনতের বাবা খানিকক্ষণ সেই নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষটির উপর তর্জন গর্জন ক'রে কি যে ব'লে গেলেন, তার অধিকাংশ তিনি বুঝতে পারলেন না। শুধু এইটুকু বুঝে বাড়ী ফিরলেন, যে সনতের বাবা একজন দুর্দান্ত সিভিলিয়ান্‌ আর তিনি একজন নগণ্য অসহায় দীন মুদী মাত্র। ভাগ্নের অপরাধে নিজেকে সম্পূর্ণ অপরাধী ব'লে স্বীকার ক'রে, জোড় হাতে বহু অনুনয় ও বহুবার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে তিনি যখন বাড়ী ফিরলেন তখন আবার এক নূতন বিপদ্‌ হ'ল তাঁর বিধবা ভগিনীকে নিয়ে। গুরুদাসের মা কেঁদে কেটে বাড়ীতে

এমন এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন যে বেচারা মুদী মহাশয় কিছুতেই আর বাড়ীতে টিঁকতে পারলেন না। সেই রাত্রেই আবার ছুটলেন সহর ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় "গুরুদাস" "ওরে গুরুদাস" ব'লে চীৎকার ক'রে তার সন্ধান ক'রতে।

এই ঘটনার পর গুরুদাসের মামার মনোযোগ হঠাৎ তাঁর দোকানটির প্রতি অত্যন্ত গভীর হ'য়ে উঠল'। বেচারী আর বাড়ীতে পর্যন্ত নাইতে খেতে যেতে ফুরসৎ পান না; এইখানেই দোকানের পাশে একটা চৌবাচ্ছায় স্নান আর স্থানীয় একটি হোটেলে তুমুঠো আহার সেরে নেন্। কিন্তু তবু কি নিস্তার আছে? অধিক রাত্রে দোকানের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে যখন অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আপনার ঘরে শুতে যান্, দেখেন যে রোজকার মত আজও বিধবা ভগ্নীটি দরজার গোড়ায় তাঁরি প্রতীক্ষায় ব'সে আছে; তারপর অনেকগুলি মিথ্যে কথা সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে বলতে হয় বিধবা ছোট বোনটিকে সান্ত্বনা দিতে।

বোনটি বলে,—"এত করে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে যখন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কি আর…?"

বাধা দিয়ে দাদা বলে ওঠেন,—"দূর পাগলি, পৃথিবীটা যে গোল, যতই ঘোর তবু কি তার শেষ আছে?"

পৃথিবীর গোলত্বই যে ঘুরে ঘুরেও সেই হতভাগা ছেলেটার সন্ধান না পাওয়ার একমাত্র কারণ, একথা দাদা সবিস্তারে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বোনটির মাথায় ঢোকে না।

তার শুধু ঘুরে ফিরে সেই এক আশঙ্কা,—"দাদা, প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে দাদা হো হো ক'রে হেসে উঠে বলেন,—"আরে সে সব কিছু হ'লে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিত না? কত বড় একজন জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলের সঙ্গে সে ঘুরছে তা জানিস? তা না হ'লে এত পয়সাই বা সে পায় কোথা যে সারা পৃথিবীটা চরকীর মত ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে?"

শিক্ষা-সংস্থানহীনা ছোট বোনটি দাদার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে,—"দাদা তোমরা যে ব'লেছিলে, ও আমার একদিন জজ্ হবে?" চোখের জলে তার গলার স্বর ভিজে ওঠে।

দাদার মনে প'ড়ে যায় ষোল বছর আগেকার একটা দিনের কথা। সেদিন এক বছরের একটা শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে আদরের ছোট্ট বোনটি বিধবার বেশ প'রে তাঁর আশ্রয়ে এসে দাঁড়াল'; দাদার চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল গড়াচ্ছে। বোনের মাথার উপর হাতটি রেখে দাদা সেদিন বলেছিলেন,—"তুই কাঁদিসনে বোন, এই ছেলে একদিন বড় হ'য়ে তোর সব দুঃখ ঘোচাবে। ওর বাবা যে যাবার সময় আমায় ব'লে গেছে, ও তোর হাইকোর্টের জজ হবে। তাই ত' তিনি ওর নাম রেখে গেছেন 'গুরুদাস'। বাপের শেষ ইচ্ছা ঐ ছেলে একদিন পূর্ণ করবেই।" তারপর আজ ষোল বছর কেটে গেছে। সেদিনকার কথা মামা প্রায় ভুলেই গেছেন, কিন্তু মা'র মনে আজও সেই আশা উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

বিধবা মায়ের সরল মনকে একই ভাবে দিন দিন ছলনা ক'রতে মামার মনে অনুতাপের অন্ত থাকে না; কিন্তু তার অন্য উপায়ও আর কিছু ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে তাঁকে তাঁর অস্থিদাহকারী ভাগিনেয় প্রবরের অনুসন্ধানে সারা রাত ধ'রে ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি ক'রে, কত আপাদমস্তক-আচ্ছাদিত-ফুটপাথশায়ীর নিকট

গুরুদাসের আকৃতিগত সাদৃশ্যের পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে অশ্রাব্য বচনাবলী শ্রবণ ক'রতে ক'রতে, কত পাহারাওয়ালার সন্দেহাবলী নিরসন ক'রতে ক'রতে, যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ক'রতে হয়েছিল, তাতে তাঁর স্থির ধারণা হ'য়ে গেছল' যে, গুরুদাসকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, অথচ অবুঝ বোনকে এই কথা কে বোঝায় ? সন্তানহীন মৃতদার মামার শেষ অবলম্বনটির জন্যে তাঁর বুকের মধ্যে যে কতখানি স্থান শূন্য হ'য়ে গেছল' তা তিনি কাউকেও জানতে দেননি ; দোকানটি নিয়েই তিনি তাঁর মনের সমস্ত শূন্য স্থান সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ক'রে নিয়েছিলেন ; কিন্তু অবলা মায়ের সেটুকু অবলম্বনও ছিল না।

সনৎ ও গুরুদাসের অজ্ঞাতবাসের এক মাস কেটে গেল, তবুও কোথাও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে ব'সে জরতের বাবা জরৎকে ব'ললেন,—"তোর মা কোথায় ? ডেকে আন।"

মা পাশের ঘরেই ছিলেন, নিজেই এলেন।

বাবা ব'ললেন,—"আমরা অপেক্ষা ক'রছি যে, এস।"

মা ব'ললেন,—"আজ তোমরা একাই খেতে ব'স, আজ আর আমি কিছু খাব না, আজ আমার উপবাস।"

মায়ের কথাটা বুঝতে যতটুকু সময় গেল, ততটুকু মাত্র গম্ভীর থেকে বাবা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ব'ললেন,—"উপবাস ? হাঙ্গার্ ষ্ট্রাইক্ ? এ অভিমান কার উপর ?"

"যা জান না, তা' নিয়ে হাসাহাসি ক'রো না।" ম্লান মুখে মা ব'ললেন,—"একমাস আমি তোমার উপর বিশ্বাস ক'রে চুপ ক'রে

ছিলুম। তোমার প্রভাব প্রতিপত্তির সব পরিচয়ই পেলুম। আর আমার মন শান্ত হ'তে পারছে না।''

মায়ের চোখের কোল দুটো জলে ভরে উঠেছিল', সেই দেখে বাবা আর কোন প্রতিবাদ ক'রতে পারলেন না।

সেদিন সকালবেলা সমস্ত বাড়ীটাতে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইতে লাগল'। আফিস যাবার সময় বাবা কিছু বলবার জন্যে মার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বাবার ম্লান মুখখানি দেখে মা'র মনটা পীড়িত হ'ল; তিনি বুঝলেন, আজ তাঁর জন্যে তাঁর স্বামীরও ভাল ক'রে খাওয়া হ'ল না। মা ব'ললেন,—''তোমার সংসারে এসে আমি ধর্ম-কর্ম সব ভুলেছি, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি, তাই ত' তিনি আমাকে এত বড একটা কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন।''

বাবা ব'ললেন,—"অনাবশ্যক উপবাস ক'রলেই কি তুমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে ব'লে মনে কর?"

মা ব'ললেন,—''না, শুধু তাঁর উপর হারাণ বিশ্বাস আবার ফিরে পাব।"

একটুখানি শুধু হেসে বাবা চলে গেলেন, মার চোখে সেই অবিশ্বাসের হাসিটুকু এড়িয়ে গেল না।

একমাসের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মায়ের শরীর একেই ক্লান্ত, উপবাসে সেদিন আরও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। দুপুরে ঘুমানো তাঁর অভ্যাস নয়; সেদিন তার ব্যতিক্রম হ'য়েছে।

দাসী চাকরেরা যে যার নিজের আস্তানায় গিয়ে ঘুমোচ্ছে। দারওয়ান রোজের মত আজও বেরিয়েছে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান ক'রতে নূতন কিছু খবর এল কি না। বাড়ীর সদর দরজা থেকে

মায়ের ঘর পর্যন্ত কোথাও কেউ সজাগ হ'য়ে বসে নেই। সনৎ চোরের মত পা টিপে টিপে এদিক্ ওদিক্ চাইতে চাইতে এক পা এক পা ক'রে আগিয়ে গেল। তার ভাগ্য ভাল, কেউ তাকে দেখতে পেলে না; কেউ তাকে অনাবশ্যক লজ্জা দিয়ে পীড়ন করলে না।

বিনা বাধায় মায়ের ঘরটিতে এসে প'ড়ে সনৎ হাঁপ ছাড়লে। মা ঘুমোচ্ছেন। প্রায় একমাস পরে মাকে দেখতে পেয়ে সনতের মনের মধ্যে সমস্ত ওলটপালট হ'য়ে গেল; তার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আশঙ্কা ও অনুতাপ কোথায় গেল ভেসে। মায়ের শুষ্ক মুখখানি দেখতে দেখতে সে আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না; ছুটে গিয়ে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো।

আচমকা মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি সনৎকেই স্বপ্ন দেখছিলেন; ঘুম ভাঙতে অনেকক্ষণ তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, সনৎ সত্যিই তাঁর কোলের কাছে এসে শুয়ে আছে, না তিনি এখনও স্বপ্ন দেখছেন?

কিছুক্ষণ ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের মন যখন একটু হাল্কা হ'য়ে এল, তখন তিনি উঠে আফিসে টেলিফোন্ ক'রলেন।

টেলিফোনে সনতের ফিরে আসার সংবাদ শুনে সনতের বাবা যে কতখানি খুসী হ'লেন, তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

তিনি শুধু ব'ললেন,—"ফিরে এসেছে? কোথায় ছিল এতদিন?"

মা ব'ললেন,—"ফিরে যখন এসেছে, সে সব কথা এখন আমি তোমায় তুলতে দেব না!"

বাবা ব'ললেন,—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

মা ব'ললেন,—"এখন তোমায় আসতে কে ব'লছে? এখন ওকে

আমার কাছে একটু একলা থাকতে দাও। বড্ড কাঁদছে, বুঝেছ ?”

“বড্ড কাঁদছে বুঝি ? ও! আচ্ছা তবে ওকে তোমার আচল চাপা দিয়ে শুইয়ে একটু দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াও।” তারপর একটু থেমে বাবা ব’ললেন,—“তুমি খেয়েছ কিছু ?”

“না।”

“আবার না কেন ? তোমার সাধনা ত’ সিদ্ধ হ’য়েছে ; এইবার খাও কিছু।”

“তুমি যদি বাড়ী এসে আমার সন্তুকে একটুও না ধমকাও, তা হ’লে তাই দেখে আমি খাব।”

অপরপক্ষ বোধ হয় বিরক্ত হ’য়েই রিসিভার ছেড়ে দিলেন।

•

গুরুদাসের বাড়ী ফেরাটা একটু নাটকীয় ধরণের হ’ল। সনৎকে তাদের বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে গুরুদাস নিজের অবস্থাটা একটু ভেবে নিলে। গুরুদাস ভাবলে, প্রথমেই মা’র কাছে গিয়ে যদি হাজির হই, মা চেঁচিয়ে এমন একটা দৃশ্য সৃষ্টি ক’রে তুলবে যে সেটা সামলানো তার পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার হবে না ; বরং তার চেয়ে ঢের সহজ ব্যাপার তার ভালমানুষ মামাটিকে বোঝান। এই ভেবে গুরুদাস সোজা মামার দোকানে গিয়ে হাজির হ’ল।

মামা তখন দোকানের মধ্যে কতকটা আধ পাগলাটের মত এদিক্ ওদিক্ ক’রে বেড়াচ্ছিলেন ; দোকানে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

গুরুদাস দোকানে ঢুকেই মামার পায়ের ধূলো নিয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম ক’রে দাঁড়াল’।

তাকে দেখেই মামা ব’ললেন,—“এই যে বাবা গুরুদাস! খুব সময়ে এসে প’ড়েছিস্। দোকান রইল, দেখিস্।”

অস্পষ্ট জড়তার সঙ্গে এই কটি কথা অতি কষ্টে ব'লে মামা ট'লতে ট'লতে দোকান থেকে বেরিয়ে প'ড়ে, রাস্তায় একটা রিক্সা ডেকে চ'ড়ে ব'সলেন ; রিক্সায় ব'সে গুরুদাসকে হাত নেড়ে ডাকলেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে গুরুদাস বললে,—"ডাকছেন ?"

"রিক্সাওয়ালাকে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা বুঝিয়ে দে ত।" তারপর ইসারা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর গলাটা ধরে গেছে, আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

ভয়ে ভয়ে গুরুদাস বললে,—"আপনার কি অসুখ করেছে ?"

গলার স্বর যেন আর বেরোতেই চাইছে না ; মামা বিকৃত, ভগ্ন ও জড়ানো কণ্ঠস্বরে অতি কষ্টে বলতে লাগলেন,—"সকাল বেলা দুবার পেট নামিয়ে শরীরটা কাহিল ক'রে দিয়েছিল , তখন ভেবেছিলুম কিছু না। কিছুক্ষণ হ'ল শরীরটা কেমন যেন বেসামাল হ'য়ে পড়েছে ; কিছুই ঠিক পাচ্ছি না।"...

গুরুদাস রিক্সাওয়ালাকে কোথায় যেতে হবে ঠিক ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে, মামাকে জিজ্ঞেস করলে,—"কিছু পয়সা আছে আপনার ?"

মামা হাত নেড়ে জানালে,—"না।"

গুরুদাস তাড়াতাড়ি দোকানের বাক্স থেকে রিক্সা ভাড়াটা এনে মামার হাতে গুঁজে দিয়ে, রিক্সাওয়ালাকে বললে,—"বাবুকো তবীয়ৎ আচ্ছি নেই হ্যায়, ঠিক্‌সে ধীর্‌সে যায়েগা।"

যাবার আগে মামা একবার গুরুদাসের মাথায় হাতটি রেখে কি যে ব'ললেন, গুরুদাস কিছুই বুঝতে পারলে না। কম্পিত ঠোঁট দুটির দিকে চেয়ে সে আন্দাজ করলে, মামা যেন বলছেন, এই দোকান আর বিধবা মাকে তার জিম্মায় দিয়ে তিনিও যেন, তারি মত, কোন অজ্ঞাত নিরুদ্দেশের পথে, রিক্সায় চ'ড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

রিক্সাখানি গলির মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হ'তেই গুরুদাসের মনে হ'ল, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম, যে মামা তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল, মার ও মামার মনে কষ্ট দিয়ে এমন ক'রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে মোটেই ভাল হয় নি।

এমন সদাশিব মামাকে ছলনা ক'রতে গুরুদাস যে সমস্ত ভাল ভাল জবাব তৈরী ক'রে রেখেছিল, সেগুলি একটা একটা ক'রে মনে পড়তে লাগল'; আর সমস্ত মনটা তার অনুতাপে পুড়ে যেতে লাগল'।

মাত্র দুজন মাহিনাকরা মুটেকে নিয়েই মামা তাঁব দোকান চালাতেন। মুটে দুটি যেমন পুরাণ, তেমনি তারা বিশ্বাসী। দুজনেই একটু আগে কোন খরিদ্দারের মাল পৌছতে গেছল'। ফিরে এসে তারা গুরুদাসকে দেখে যেমন অবাক্ হ'ল, তেমনি অবাক্ হ'ল তাদের কর্তাবাবুর হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে বাড়ী চলে যাওয়ার খবর শুনে।

গুরুদাস একটা মুটেকে মামা ঠিক বাড়ী পৌছল' কি না জানবার জন্যে পাঠাচ্ছিল, এমন সময় একজন পুরাণ খরিদ্দার এসে পড়লেন, আর তার যাওয়া হ'ল না। এই খরিদ্দারের মাল ওজন ক'রে ডেলিভারী দিতে দিতে আরও দুএকজন খরিদ্দার এলেন। সকলের ফরমায়েস মাফিক্ মাল ওজন ক'রতে ক'রতে ও বাড়ী বাড়ী মাল পৌছে দিতে দিতে সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

সন্ধ্যের সময়।

রোজের প্রথা মত মুটে দুটি বিজলী বাতি নিবিয়ে দিয়ে দিলে ছোট্ট প্রদীপটি জ্বালিয়ে। দোকান ঘরের চারিদিকে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিয়ে, ধুনো দিয়ে ধুনুচীটি এনে ক্যাস্ বাক্সের উপর বসিয়ে দিলে।

গুরুদাস বাক্সটি প্রণাম ক'রে ধুনুচীটি তুলে যখন উর্ধ্ব দিকে ঘোরাতে লাগল', তখন অন্ধকারের অস্পষ্টতার মধ্যে তার যেন স্পষ্ট মনে হ'ল, মামা চালের ঐ বড় বোরাটার পাশে এসে খানিকক্ষণের জন্যে দাঁড়ালেন, তারপর উপরি উপরি সাজান ঘিয়ের টিনগুলির পাশে স'রে গেলেন। গুরুদাসের বুক ও হাত কেঁপে উঠল'; হাতের ধুনুচীটি সশব্দে প'ড়ে গিয়ে চারি দিকে আগুন ছড়িয়ে দিলে। মুটে তুটী গণেশের মূর্তির দিকে চেয়ে হাত তুলে প্রণাম ক'রছিল; তারা 'কি হ'ল' 'কি হ'ল' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে, বিজলী বাতি জালিয়ে দিলে। গুরুদাস চেঁচিয়ে ব'লে উঠল'—"মামা ফিরে এলেন বোধ হয়, ঐখানে দেখ ত।"

মুটে তুটো জলন্ত কয়লাগুলো ধুনুচীতে তুলতে তুলতে বললে,—"খোকাবাবু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন ?"

গুরুদাস বললে,—"হয়ত স্বপ্নই দেখলুম। কিন্তু মামার জন্যে বড্ড ভাবনা হ'চ্ছে রে। অসুস্থ মানুষটাকে একলা যেতে দিলুম; বাড়ীতেই বা কে আছে যে বেশী কিছু হ'লে সামলাবে!…নে দোকান বন্ধ কর। বাড়ীর জন্যে মন ছট্‌ফট্ ক'রছে।"

তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ ক'রে দোকানের চাবি ও ক্যাস্ বাক্সের টাকাগুলি নিয়ে গুরুদাস বাড়ীর দিকে ছুটল'; কিন্তু বড়ই মন্দভাগ্য তার, মামার সঙ্গে আর শেষ দেখা হ'ল না। সে ঝড়ের মত মামার ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলে তাতে তার বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল। সে দেখলে মামার সদ্যমৃত দেহটার পাশে ব'সে তার মা আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার ক'রছেন।

গুরুদাসকে দেখে মায়ের চীৎকার আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন,—"ওরে হতভাগা ছেলে, সেই যদি ফিরে এলি ত'

আর দুঘণ্টা আগে আসতে পারলিনি ? তোর মামা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে জন্মের শোধ পালিয়ে গেল রে !"

মুখর গুরুদাস আজ সর্বপ্রথম জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পেলে না। সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল', মুখে একটিমাত্র তিরস্কার না ক'রে মামা কি কঠিন শাস্তিই না আজ তাকে দিয়ে গেলেন।

সেই রাত্রি গুরুদাসের জীবনে সর্বাপেক্ষা দুদিন। কলেরা শুনে সকলেই গেল পেছিয়ে। ছেলে মানুষ সে, লোকের পায়ে ধ'রে কেঁদে কেঁদে, মাত্র কয়েকজন সঙ্গী পেলে। তাদের সাহায্যে কি অকথ্য কষ্টে সে সেদিন মামার শেষকৃত্য সমাধা ক'রলে তা তার বোধ হয় শেষ জীবন পর্য্যন্ত মনে থাকবে।

এই ধাক্কায় গুরুদাসের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। কোথায় গেল তার সে চপলতা, কোথায় গেল তার সেই সব উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি ; একদিনেই যেন তার বয়স পঁচিশ বছর আগিয়ে গেল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মামার এই ছোট্ট মুদির দোকানটিতে গুরুদাস তার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিলে। ক্যাস বাক্সের সামনে বসে সে যখন তার খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তার ব্যবসায়ী বুদ্ধির প্রখরতা দেখে কি কেউ অনুমান ক'রতে পারে যে, এই গুরুদাস মাত্র দু'মাস পূর্বে স্কুলে একটি নির্বোধতম ছাত্র ছিল। স্কুলের কথা মনে হ'লে গুরুদাসের কি মনে হয় কে জানে ? হয়ত সে মনে মনে একটু হাসে। কিন্তু সারদা পণ্ডিত মশায়ের কথা মনে হ'লে, তার মনটা ভিজে ওঠে ; মনে হয় তাঁর স্নেহ-আশীর্বাদ জীবনে কখনই ভোলবার নয়। আর সনৎ ? ঐ একটা নাম এখনও গুরুদাসকে চঞ্চল ক'রে তোলে। তার

কথা মনে হ'লে কিছুই আর ভাল লাগে না, ছুটে গিয়ে অন্ততঃ একবার চোখের দেখা দেখে আসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়, মাঝে এখন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সনৎ যে তার বাপের জেলখানায় কিভাবে আটক পড়েছে মুখে মুখে সে সব কথা গুরুদাসও শুনেছে।

আফিসে টেলিফোন ক'রে ফিরে আসতে সনৎ মাকে জিজ্ঞেস করলে,—"মা, বাবা কি ব'ললেন ?"

সনতের ভয়ার্ত ম্লান মুখখানির দিকে চেয়ে মা একটুখানি ম্লান হাসি হেসে ব'ললেন,—"সে সব কিছু ভয় নেই তোর সনু। তুই যে ফিরে এসেছিস এই আমাদের কত ভাগ্য।"

তারপর মা সনৎকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ব'ললেন,—"আয়, কিছু খাবি আয়। সেখানে বুঝি ভাল ক'রে খেতিস না ? চেহারা একেবারে শুকিয়ে কালীবর্ণ হ'য়ে গেছে !"

সন্ধ্যার বাতি জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে ফটকে একটা পরিচিত হর্ণ বেজে উঠল'। সনৎ মা'র কোল ঘেঁসে ব'সল, একটা বড় রকমের অগ্নি-পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ; ভয়ে তার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল'। মা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব'ললেন,—"যখন অন্যায় করিস তখন এসব মনে থাকে না ?" মায়ের মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে বাবা এসে হাজির হ'লেন আফিসের পোষাক প'রেই।

বাপের মুখের দিকে চেয়ে সনৎ আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। বাপের বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে, তার দিকে চাওয়া যায় না ; অথচ চোখ ফিরিয়ে নেবার সাহস ও শক্তি তখন সনতের একটুও ছিল না। প্রায় মিনিট্ কয়েক এমনি ভাবে ছেলের দিকে চেয়ে থেকে বাবা বিনা বাক্যব্যয়ে যখন চ'লে যাচ্ছিলেন,

তখন মা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন,—"যা সন্নু, ওঁর পায়ে হাত দিয়ে মাপ চা।" মার কথামত সনৎ উঠে আগিয়ে গেল; বাবা ঘৃণাভরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে মা বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"সন্নু আজ থেকে স্কুল যাবে ত' ?"

বাবা ধমকে উঠলেন,—"স্কুলে ? যত সব বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ?"

মা ব'ললেন,—"তবে আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই; বাড়ীতেই ও পড়ুক। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক্‌ ত' কত ছেলেই দেয়।"

মুখখানি বিকৃত ক'রে বাবা শুধু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে মা ব'ললেন,—"ওর মাষ্টারকে তাহ'লে আসতে ব'লে দিও।"

বাবা রুখে উঠলেন, ব'ললেন,—"কেন আমার পয়সা কি এত সস্তা যে দরিয়ায় ঢালতে যাব ?"

মা ভয়ে ভয়ে ব'ললেন,—"তবে ও কি করবে, ব'লে দাও ?"

"ওর যা খুসী যায় করুক, ওর জন্যে আমি আর একটি পয়সাও অপব্যয় ক'রব না।"

সেই দিন থেকে সনতের লেখাপড়া বন্ধ হ'ল।

সেইদিন মা ভেবেছিলেন, সনৎ যা অন্যায় ক'রেছে, তাতে তার বাপের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। দুদিন গেলেই রাগ প'ড়ে যাবে।

কিন্তু দুদিন ছেড়ে ছ'মাস কেটে গেল; সনৎ সম্বন্ধে তার বাপের ঔদাসীন্য একটুও লাঘব হ'ল না। এই ছ'মাস সনতের সঙ্গে তার বাবার একটিও বাক্য-বিনিময় হয়নি। সনৎকে কখন কাছে ডাকা

চুলোয় যাক, সে যদি কখন দৈবাৎ বাপের কাছে গিয়ে পড়েছে ত' বাবা তৎক্ষণাৎ তাকে স'রে যেতে ইসারা ক'রেছেন। বাপের এই বিসদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহার সনতের মনে যত না লাগুক তার দশগুণ লাগত' তার মা'র মনে। মা প্রতিকার কিছুই ক'রতে পারতেন না, শুধু লুকিয়ে কাঁদতেন।

সেদিন সনতের জন্মদিন।

গত বৎসরও এই দিনে বাড়ীতে একটু আনন্দ কলরব শোনা গেছল'। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মায়ের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল'। সাহস ক'রে বাবাকে তিনি কিছুই ব'লতে পারলেন না; পাছে এই বৎসরকার দিনটাতে সনতের উপর তার বাপের কোন অভিশাপ বর্ষিত হয়।

সমস্ত সকালটা মায়ের দুশ্চিন্তায় কাটল'। তারপর বাবা আফিসে বেরিয়ে যেতে মা মন স্থির ক'রে ফেললেন; তিনি স্থির ক'রলেন, মা হ'য়ে আজকের দিনটা তিনি কিছুতেই নিরানন্দে কাটতে দেবেন না।

আফিস থেকে গাড়ী ফিরে আসতে সেই গাড়ীতে তিনি সনৎকে পাঠালেন মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ ক'রতে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বেই, সনতের বাবা আফিস থেকে ফেরবার আগেই, চার মামা ও চার মামী এসে হাজির হ'লেন। বাড়ীতে হাসির ফোয়ারা ছুটল'; নিরানন্দ নীরস বাড়ীখানি ক্ষণিকের জন্যে আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল'। সনতের মামীদের হাসি যথার্থই উপভোগ্য; অফুরন্ত ঝরণার জলের মত অবিশ্রান্ত ঝরে প'ড়ছে। সেখানে দুঃখ নেই, দুশ্চিন্তা নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই,—অনাবিল একটা আনন্দের

ধারা সমস্ত পরিব্যাপ্ত ক'রে ঝরে প'ড়ছে। আফিস থেকে ফিরে বাড়ীতে পা দিতেই সনতের বাবার কানে সেই হাসির স্পর্শ লাগল'।

সনতের মায়ের একটা গুরুতর দুশ্চিন্তা ছিল, বাড়ীর কর্তা এসে আজ সন্ধ্যার এই অতিথিদের না জানি কিভাবে সমাদর করেন। হয়ত' এ দুশ্চিন্তার একটা যথার্থ কারণও ছিল; কিন্তু মামীদের সেই ভুবন-ভুলান-হাসি সিভিলিয়ানের শাসন-কঠিন পাষাণ-প্রাণেও একটা স্পন্দন জাগিয়ে তুললে।

সন্ধ্যার পর সকলে যখন ভোজের টেবিলের চারিদিকে সমবেত হ'লেন, তখন মায়ের মন থেকে সব মেঘ কেটে গেছে।

আহার আরম্ভ করবার পূর্বে বড় মামা উঠে একটা মূল্যবান্ ঝরণা কলম সুনৎকে উপহার দিয়ে ব'ললেন,—"আজকে তোমার জন্মদিনে আমরা তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রছি, আর কামনা ক'রছি যেন বড় হ'য়ে তুমি তোমার বাবার মতই বিদ্বান্ ও যশস্বী হও।"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ঝরণা কলমটি মামার হাত থেকে নিয়ে সনৎ মায়ের হাতে দিল'। মা হাত বাড়িয়ে বাবার সামনে সেই কলমটী ধ'রে ব'ললেন,—"আজকের দিনে তুমিও ওকে এমনি ক'রে আশীর্বাদ কর।"... মায়ের মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে নিতান্ত অভদ্রের মত সকলকে স্তম্ভিত ক'রে বাবা নিজের আসন ছেড়ে উঠে চ'লে গেলেন।

আপনার খাস কামরায় প্রবেশ ক'রে বাবা একটা আরাম কেদরায় নিশ্চল পাষাণের মত শুয়ে প'ড়লেন। মা উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই ঘরে এসে ব'ললেন,—"ওগো, আমি যে কদিন বেঁচে আছি, সেই কটাদিন অন্ততঃ, আমার সনুকে ছেলে ব'লে স্বীকার ক'রো, আমি মরে গেলে, তুমি ও'কে গলা টিপে মেরে ফেল', আমি দেখতে আসব' না।"

মায়ের চোখের জল, মুখের সেই আকুলতা, পাষাণ পিতার বুকে

একটুও দাগ. কাটতে পারল' না; তিনি নিশ্চল নির্বিকারভাবে যেমন ছিলেন তেমনিই শুয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না।

মায়ের পর মামারা এলেন দরবার ক'রতে। সনতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা বহু অযাচিত উপদেশ দিলেন। বাবা ব'সে ব'সে নীরবে সব শুনলেন; প্রত্যুত্তরে হাঁ বা না কিছুই ব'ললেন না।

চার মামা যখন একে একে বক্তৃতা ক'রে যাচ্ছিলেন, তখন মাও এসে আলোচনায় যোগ দিলেন।

মা বক্তৃতা দিতে জানেন না; অতি শান্ত মিনতিপূর্ণ স্বরে ব'ললেন,—"তাই কেন তুমি কর না? সনুর লেখাপড়ায় যখন মন নেই, ওকে ব্যবসার লাইনে দিয়েই একবার দেখ না।"

ছোট মামা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন, এইবার রীতিমত মুরুব্বিয়ানা চালে ব'লে উঠলেন,—"ব্যবসা ক'রলে সনু এত টাকা ঘরে আনতে পারবে যে দশটা আই-সি-এস্ কখন অত টাকা এক সঙ্গে চোখে দেখেনি।"

এত বড় একটা কথা এই দাম্ভিক সিভিলিয়ানটির মুখের উপর কেউ কখন ব'লতে সাহস ক'রে নি; তবুও আজ তাঁর কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ শোনা গেল না। মা ভাবলেন, হয়ত' কথাটা মনে ধ'রেছে। তাই জন্যে আলোচনাটাকে আর বেশী বক্রগতিতে আগাতে না দিয়ে, রাত হ'য়ে যাওয়ার অজুহাতে মামাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন।

যাবার সময় মেজমামা ব'ললেন,—"লোকটা বই পড়ে পড়ে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে; না আছে একটু মায়াদয়া, না আছে কোন কাণ্ড-জ্ঞান।"

যাবার সময় মামীদের মুখে আর সে হাসি ছিল না; এই নিরানন্দ বাড়ীর ছোঁয়াচ তাঁদের সুন্দর মুখগুলিতেও কালিমা ঢেলে দিয়েছিল।

রাত্রে শুতে যাবার আগে, মা বাবার কাছে আবার সেই প্রসঙ্গ তুললেন; সন্নুকে কোন ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে জেদ ক'রতে লাগলেন। কিন্তু বাবার দিক্ থেকে সম্মতি বা অসম্মতি সূচক কোন জবাবই পাঁওয়া গেল না। মা তাঁর মৌনভাবকে সম্মতির লক্ষণ ব'লেই বুঝে নিলেন।

সেই রাত্রে মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর সন্নু ব্যবসা ক'রে রাজা হ'য়েছে; সারা দেশ তার সুনামে ভ'রে উঠেছে। আনন্দে মা'র ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর বাকী রাতটা পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় বিভোর হ'য়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রেই তিনি কাটিয়ে দিলেন, একটুও ঘুমোতে পারলেন না।

•

পরের দিন ভোর হ'তে না হ'তে সনৎকে তার বাবা ডেকে পাঠালেন। বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার সেই লজ্জাকর ঘটনার পর, এই সর্ব প্রথম সনৎকে ডেকে তার বাবা কথা ব'ললেন। বাবা ব'ললেন,—"তোমার মামাদের বড় ইচ্ছা যে তুমি ব্যবসা কর; তোমার মায়েরও ইচ্ছা তাই, তোমারও কি সেই ইচ্ছা?"

সনৎ ঘাড় নাড়লে, ঠোঁট দুটোও হয়ত' তার একটু নড়ল'; কিন্তু মুখ দিয়ে কোন স্বর বেরোল' না।

বাবা ব'ললেন,—"তুমি কিন্তু মনে ক'রো না যে তোমার ব্যবসা করবার খেয়াল মেটাতে আমি তোমার পেছনে হাজার হাজার টাকা নষ্ট ক'রব। তোমাকে আমি মাত্র পাঁচ টাকা দেব; এই নিয়ে তোমায় ব্যবসা আরম্ভ ক'রতে হবে। দেখ রাজি আছ?"

সনৎ ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে যে, সে রাজি আছে।

বাবা তৎক্ষণাৎ গাড়ী ক'রে সনৎকে নিয়ে ক'লকাতার কোন একটি

বিখ্যাত বাজারে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে একটি দাঁড়ীপাল্লা, কয়েকটি বাটখারা ও কয়েকসের আলু কিনিয়ে, বাজারে দৈনিক ভাড়ার একটা বন্দোবস্ত ক'রে, খোলা মাঠের উপর চট পেতে সনৎকে বসিয়ে দিলেন। তারপর সেই চটের উপর সাত আনা পয়সা রেখে দিয়ে ব'ললেন,—"পাঁচ টাকা থেকে এই সাত আনা পয়সা বেঁচেছে; এই নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ কর'। বাড়ী ফিরে গিয়ে হিসেব দিতে হবে।"

বাবা চ'লে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে দাঁড়ালেন, ব'ললেন,—"যদি সমস্ত আলু না বেচতে পার, যা বাকী থাকবে, মাথায় ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। বাড়ী যাবার সময় হেঁটেই বাড়ী যাবে; গাড়ী নিতে আসবে না।"

বাবা চ'লে যাচ্ছিলেন; সঙ্গে একটা চাকর ছিল, সে ভয়ে ভয়ে বললে,—"খোকাবাবু কিছু খেয়ে আসে নি।"

বাবা একবার কট্‌মট্ ক'রে চাকরটির দিকে চাইলেন, তারপর সনতের চটের উপর ছড়ান পয়সাগুলি থেকে একটা পয়সা তুলে নিয়ে চাকরটিকে একপয়সার মুড়ি কিনে আনতে ব'ললেন। সেই একপয়সার মুড়ি সনতের হাতে দিয়ে বাবা আর পিছন ফিরে না চেয়ে চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। মুড়ি অভুক্ত অবস্থায় একপাশে প'ড়ে রইল।

চাকরটি বাড়ী এসে গৃহিণীর কাছে সব কথা ব'লে দিলে।

মায়ের আশার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল; দুঃখে ক্ষোভে তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কিন্তু শুধু রাগ ক'রলেই ত' এর প্রতিকার হবে না। তিনি ছুটলেন বাবার পড়বার ঘরে, যেখানে সেই চিরসাধক বইএর মধ্যে ডুবে বাহিরের জগৎটাকে ভোলাবার চেষ্টা ক'রছেন। সেইখানে গিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠলেন,—"বুড়ো হ'তে না হ'তে কি তোমার ভীমরতি ধ'রেছে? আমার দুধের

বাছাকে বাজারে রেখে এলে আলু বেচতে? ছেলেটাকে প্রাণে না মেরে তোমার মনটা শান্ত হ'বে না, না?"

বাবার দিক্ থেকে কোন জবাব এল' না।

মায়ের মুখে কেউ কখন অশিষ্ট বাক্য শোনে নি। কিন্তু আজ পুত্রের এই অভূতপূর্ব নির্যাতনের কথা শুনে তাঁর মনের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

বাবার দিক্ থেকে কোন জবাব না পেয়ে মা আবার ব'ললেন,—"দারওয়ানকে গাড়ী ক'রে পাঠাও তাকে নিয়ে আসুক; বাছা আমার সকালে চা টোষ্ট্ পর্যন্ত খেয়ে যায় নি।"

বই থেকে মুখ না তুলেই শান্তভাবে বাবা ব'ললেন,—"আজ থেকে ওর চা. টোষ্ট্ বন্ধ; ওকে আর সাহেব ক'রতে হবে না। এবার থেকে খানিকটা ক'রে ছোলা ভিজিয়ে রেখ' তাই চিবতে চিবতে ও রোজ ভোর না হ'তে বাজারে যাবে। এই আমার হুকুম,—এর নড়চড় হ'তে পাবে না।"

এই ব'লে বাবা সেখান থেকে উঠে গেলেন। মা নিতান্ত অসহায়ভাবে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলেন।

এদিকে বাজারে ততোধিক অসহায়ভাবে সনৎ ব'সে ব'সে ভাবছিল তাকে কি করতে হবে। দু একজন ক'রে খরিদ্দার তার সামনে এসে, তার আলুগুলি নেড়ে চেড়ে একপো আধসের ক'রে দিতে হুকুম ক'রছিল, কিন্তু সনতের দিক্ থেকে কোন জবাব কি কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তারা বিরক্ত হ'য়ে ব'কতে ব'কতে, কেউ বা দুএকটি কটু বাক্যবান্ বর্ষণ ক'রে, চলে যেতে লাগল'। সনতের কিন্তু সেদিকে মোটেই হুঁস নেই; সে শুধু ব'সে ব'সে ভাবছিল, তার প্রতি তার বাবার

অবহেলা আর অনাদরের কথা ; লেখাপড়া সে নাই বা শিখতে পারলে, তবুও ত' সে ছেলে। অভিমানে তার চোখের কোল দুটো জলে ভরে উঠেছিল।

ঠিক এমনি সময় গুরুদাসের একটা ডাকে তার ভাবান্তর হ'য়ে গেল।

গুরুদাস এসেছিল সকাল বেলা বাজার ক'রতে। খুব ভোরে ভোরে উঠে সে দৈনিক সংসারের বাজার সেরে দোকান খুলে ব'সত ; কিন্তু আজ অনেক দিন পরে সনৎকে পেয়ে সে দোকানের কথা ভুলে গেল।

গুরুদাস সনতের পাশে বসে প'ড়ে বললে,—"বেশ ক'রেছিস, সনৎ, ব্যবসা ধ'রেছিস। লেখাপড়া শিখে ত ছাই হবে। গীতায় লেখা আছে, জানিস ত, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

তারপর গুরুদাস সনতের দাঁড়িপাল্লাটা হাতে তুলে নিয়ে চেঁচাতে লাগল',—"ভাল নৈনী আলু, দশ পয়সা সের, নিয়ে যান্, উঠে গেল সব।" দেখতে দেখতে তাদের সামনে খরিদ্দারদের ভিড় জমে গেল। এই দুইটী প্রিয়দর্শন বাঙালীর ছেলে, মাঠের উপর চটে ব'সে আলু বিক্রী ক'রছে, বাজারে এ এক অভিনব দৃশ্য। যাদের প্রয়োজন নেই তাঁরাও একপো আধসের ক'রে আলু কিনে নিয়ে যেতে লাগল'।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব আলু বিক্রী হ'য়ে গেল। গুরুদাস চট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল'। তারপর পয়সাগুলো গুণে সনৎকে বুঝিয়ে দিলে যে আজ তার পৌনে ছ' আনা লাভ হ'য়েছে।

"তোর বৌনী ভাল হ'য়েছে সনু", গুরুদাস সনতের পিঠ চাপড়ে বললে,—"কিন্তু আজকের এই লাভের পয়সাগুলো যেন খেয়ে বসে থাকিস নি। মা'র হাতে নিয়ে গিয়ে দিবি, আর বলবি, কালীঘাটে

মায়ের কাছে আর যেখানে যেখানে মা ভাল বুঝবেন, যেন পূজো পাঠিয়ে দেন।"

গুরুদাসের সঙ্গে দুঘণ্টা থেকে আর তার স্বচ্ছ ব্যবহারে সনতের মনের সব মেঘ কেটে গেল। জীবনের এই সাফল্যে সেও আজ ভারী খুসী। বাবার উপর আর তার কোন অভিমান নেই। সে শুধু ভাবতে লাগল' বাবার কাছে গিয়ে সে যখন বলতে পারবে যে আজ সে নিজে কিছু রোজগার ক'রেছে তখন বাবা কতই না খুসী হবেন। তাঁর এই অপদার্থ ছেলেটির মধ্যেও যে কিছু পদার্থ আছে, এ কথা ত' আজ নিশ্চয় তাঁর মনে হবে।

গুরুদাসকে সনৎ কিছুতেই ছাড়লে না। তাদের উভয়ের জীবনের কত কি সুখ দুঃখের কথা ব'লতে ব'লতে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চ'লল' সনৎদের বাড়ীর দিকে।

একটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখা যায় সামনেই সনৎদের বাড়ী। সেখান থেকে সনৎ দেখতে পেলে গাড়ী বারান্দায় তার বাবা পায়চারী ক'রছেন। দূর থেকে তাঁর মুখখানি ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু চলবার ভঙ্গী দেখেই সনৎ বুঝে নিলে যে বাবা খুব রেগে আছেন।

এক মুহূর্তে সনতের সব আশা আর উৎসাহ নিবে গেল, মুখখানি কাঁচুমাচু করে সনৎ বললে,—"ভাই গুরুদা, আজ তুই বাড়ী যা; আর একদিন তোকে আমার মা'র কাছে নিয়ে যাব।...আচ্ছা যা তবে; কাল আবার দেখা হবে বাজারে ঠিক ঐ জায়গায়। কাল আসিস কিন্তু ঠিক; তোকে না দেখতে পেলে আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাবে।"

সনৎ চলে গেল। ক্ষুণ্ণ মনে গুরুদাস ফিরে চলল'। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার প্রাণটা টা টা ক'রছে; ভেবেছিল সনৎদের বাড়ী গিয়ে

অন্ততঃ এক কাপ চা'ও পাবে। বেলা হ'য়ে গেছে ; এত বেলায় বাজার নিয়ে বাড়ী গেলে ত' মা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রবেন। তার চেয়ে আজকের বাজার থাক, গুরুদাস চলল' তার দোকানের দিকে।

সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, তার উপর রোদেতে অতখানি রাস্তা হাঁটা। গুরুদাস রাস্তায় যেতে যেতে একটা হোটেলে ঢুকে এক কাপ চা কিনে খেলে। হোটেলওয়ালাকে পয়সা দিতে গিয়ে সামনে দেওয়ালে টাঙ্গান ঘড়িটা চোখে পড়ল'। তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। কোঁচায় ঘামটা মুছতে যাচ্ছিল, তা আর মোছা হ'ল না; সে হন্‌হন্‌ করে ছুটল' দোকানের দিকে।

দোকানে যেতেই ত' মুটে দুটো চীৎকার ক'রে উঠল'। এ কি বাবুর আক্কেল! সকাল থেকে কত খরিদদার এসে ফিরে গেল। তাদেরও দোকান আর বাড়ী, আর বাড়ী আর দোকান, ক'রে হায়রানির ত' অন্ত নেই। বাড়ীতে গিন্নী মা ত' কান্নাকাটি স্বরু ক'রে দিয়েছেন।

সব শুনে গুরুদাস খুব রেগে গেল, বললে,—"যত নষ্টের গোড়া ত' ঐ সনৎ ইডিয়টটা। মুরদ্‌ নেই একটু ও গেছে আলুর ব্যবসা করতে। আরে তুই এক ক্লাশে দুবার ফেল করলি, তুই করবি ব্যবসা? হ'য়েছে!"

তারপর গুরুদাস একটু শান্ত হয়ে বললে,—"যাক্‌ গে একদিন একটু লোকসান হ'য়েছে ত' আর কি হবে বল? সংসার চালাতে গেলে, অমন একটু আধটু হয়। ভাতের থালার সব ভাতগুলো কি পেটে যায়? দু একটা কি পড়ে থাকে না? তোরা একজন যা বাবা, মাকে একটু খবর দিয়ে আয়, আমি ঠিক আছি, পালাই নি।"

এদিকে সনৎ বাড়ীতে ঢুকে ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল'।

বাবা জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"কি হ'ল ?"

সনৎ বললে,—"আজ আমার পৌনে ছ' আনা লাভ হ'য়েছে।"

"পৌনে ছ' আনা ? দিনে পৌনে ছ' আনা উপার্জন হ'লে, মাসে কত হবে ?"

সনৎ পড়ল' বিপদে। প্রথমে সে মুখে মুখে হিসেব করবার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু কিছুই সুবিধা ক'রে উঠতে পারলে না। প্রথম বার হিসাবে যে ফল হ'ল দ্বিতীয়বারে হ'ল তার দ্বিগুণ আর তৃতীয়বারের হিসাবে সেই সংখ্যা অসম্ভব রকম কমে গেল। মুখে মুখে যখন কিছুতেই হিসাব মিটল' না, তখন সে ছুটল' একটা কাগজ পেন্সিল আনতে। বাবা ছট্‌ফট্ ক'রে পায়চারী ক'রতে লাগলেন; তাঁর মনের অব্যক্ত বেদনা তিনি যেন আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলেন না।

কাগজ পেন্সিল এনে অনেকবার মাথা চুলকে অনেকবার কেটে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে একটা উত্তর আবিষ্কার করে ফেললে, তারপর বাবার জলন্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললে,—"সাইত্রিশ টাকা সাত আনা সাড়ে এগার পাই।"

উত্তর শুনে বাবা ত' একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। এমন বিকট হাসি এই রাসভারী গম্ভীর সিভিলিয়ানটির মুখে ইতিপূর্বে কেউ কখন শোনে নি। হাসি আর তাঁর থামতে চায় না। দূর থেকে শুনলে মনে হবে যেন একটা পাগলের হাসি। মা ছুটে এলেন; চাকর দারওয়ান যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সকলেই ভীত হ'য়ে পড়ল' বাবুর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে। মাকে দেখে বাবা কি যেন ব'লতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ব'লতে পারলেন না। তাঁর মুখের কথা

মুখেই আটকে রইল, তিনি চৌকী থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারালেন।

সারাদিন বাড়ীর উপর দিয়ে একটা উদ্বেগের ঝড় বয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর মনে হ'ল যেন রোগীর জ্ঞান একটু একটু ক'রে ফিরে আসছে। রোগীর ঘরে তখন কেবল একজন নার্স ও একজন ডাক্তার ছিলেন।

রোগীর ঠোঁট ছুটো কেঁপে উঠল'; কি যেন বলতে চেষ্টা ক'রলেন।

নার্স ইসারা ক'রে ডাক্তারকে ডাকলেন।

খুব অস্পষ্টভাষায় রোগী বলতে লাগলেন,—"ডাক্তার ?"

ডাক্তার ব'ললেন,—"হাঁ আমিই ডাক্তার, কি বলুন ?"

"অপারেশন্ সাক্‌সেস্‌ফুল হ'য়েছে ত ?

"অপারেশন্ ? অপারেশন্ ত কিছুই করা হয়নি। আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন।"

"হয়নি ? তবে এই বেলা ক'রে ফেলুন। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমার মস্তিষ্ক থেকে আমার বিদ্যে বুদ্ধি আজীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞানরাশি অপারেশন্ ক'রে আমার সনতের মাথায় ঢুকিয়ে দিন; আমাকে চিরকালের জন্য মূর্খ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে দিন।"

তারপর একটুখানি হাঁপ ছেড়ে ডাক্তারের হাতদুটি ধ'রে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বাবা ব'ললেন,—"আমার প্রথম জীবনের সমস্ত আশা যে তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যে আমার চিরদিন মূর্খ হ'য়ে থাকবে, তার জীবন যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, এ চিন্তা যে মরণের দ্বারে এনেও আমায় শান্তি পেতে দিচ্ছে না, ডাক্তার।"

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। নার্সের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"ডিলিরিয়াম্‌।"

রোগীর ছটফটানি বেড়েই চলল'; কথা আর তাঁর থামতে চায় না। কিন্তু জিহ্বার জড়তায় ভাষার অস্পষ্টতায় কিছুই বোঝা যায় না কি যে তিনি বলতে চাইছেন। শুধু সনতের নামটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আর বোঝা যাচ্ছে হতভাগ্য সন্তানের জন্যে বাপের শেষ আকুলতা।

মা এই সময় রোগীর ঘরে এসে বসলেন।

রোগীর আকুলতা দেখে তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল গড়াতে লাগল'।

সনৎ দরজার পাশ দিয়ে পরদাটা একটু ফাঁক ক'রে উঁকি মারছিল, তাকে দেখতে পেয়ে মা বলে উঠলেন,—"ওরে সনৎ, তোর জন্যে যে তোর বাপের বুকটা ফেটে যাচ্ছে।"

সনৎ ছুটে ঘরে ঢুকে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল'। ছেলের কান্না দেখে মায়ের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

ডাক্তার অস্থির হ'য়ে বলে উঠলেন,—"না, না, একি অন্যায় ক'রছেন, আপনারা? মিছিমিছি আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছেন।"

নার্স মাতা ও পুত্রকে জোর ক'রে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

তারপর আরও দু'জন খ্যাতনামা চিকিৎসক এলেন। রাত বারটা পর্যন্ত প্রাণপণে চিকিৎসা চলল'! বারটার পর যখন সব চেষ্টাই বিফল হ'য়ে গেল, যখন ডাক্তাররা হতাশ হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন মা আর দুই ছেলেকে আবার রোগীর ঘরে আসবার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

ভোরের দিকে সব শেষ হ'য়ে গেল।

মা কেঁদে উঠলেন।

সনৎ বাবার পা দুটোর উপর আছড়ে পড়ল'—"ওগো বাবা, তুমি একটিবার চেয়ে দেখ। এবার থেকে আমি তোমার কথা শুনব', ভাল ছেলে হব, লেখাপড়া শিখব', তোমাকে খুসী করবার, তোমার মুখ রাখবার, চেষ্টা করব';…আর আমি তোমার ফেল্-করা-ছেলে হ'য়ে থাকব' না,…তোমার মনের মত হব',…তুমি শুধু একটিবার চেয়ে দেখ বাবা।"

বাবার মুখের উপর এমন ক'রে বলবার সাহস বা সুমতি সনতের কোনদিন হয় নি। আজ যখন সে সুমতি তার ফিরে এল তখন বাবার কাণদুটি চিরকালের জন্যে বধির হ'য়ে গেছে।